হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে
তানসেনের স্থান

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের
মুখবন্ধ সংবলিত

শ্রীধর প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী ● কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রণে ঃ
ডায়নামিক প্রিন্টার্স
২৪এ, বাগমারি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৫

প্রকাশকঃ
শ্রীনীহারেন্দু পান
শ্রীধর প্রকাশনীর পক্ষে
২০৩/৪ ডি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমার সঙ্গীতগুরু

পরম শ্রদ্ধাভাজন পরলোকগত

মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব রবাবী

ও

উজীর খাঁ সাহেব বীণকারের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

উৎসর্গ করিলাম

মুখবন্ধ

মিয়াঁ তানসেনের নাম ভারতবর্ষের বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সকলেরই নিকট পরিচিত। জনশ্রুতি পরম্পরায় এই নামের সঙ্গে এমন সব ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকার উদ্ভব হয়েছে, যে গুলি ঐতিহাসিক কিনা, এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি করলেও আমাদের কুতূহল ও শ্রদ্ধার উদ্দীপনা করে।

বিশেষ ক'রে ধ্রুপদগান ও আলাপ সম্বন্ধে যাঁরা ওস্তাদ বলে আজকাল আমাদের পরিচিত—তাঁদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির গুরু-শিষ্য পরম্পরার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায়—তিনি পর্য্যায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে—তানসেনের কোনও না কোনও বংশ-ধরের নাম এসে পড়ে। অর্থাৎ এই সকল সঙ্গীত শিল্প-সকলই তান-সেনের অনুবর্ত্তী। মাত্র এই কথাটি ভেবে দেখলে—আমরা বুঝতে পারব যে তানসেন এবং তাঁর ধারা আধুনিক ভারতে প্রচ্ছন্নভাবে কতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে।

তানসেন একজন সঙ্গীতের মহাপুরুষ ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এবং অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনীর মত তানসেনের জীবনীও রহস্যে আচ্ছন্ন। ঐতিহাসিকের ক্ষীণালোকপাতে তাঁর জীবনের যেটুকু আমাদের কাছে দেখা দেয়—তাতে তানসেন একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন—এছাড়া আর কিছুই লভ্য নয়। এমন কি তাৎকালিক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজলের লিপিবদ্ধ সংগ্রহের মধ্যে তানসেন ধ্রুপদ গান করতেন কিনা, তারও কোন উল্লেখ নেই। তানসেনের গানের অন্তর্নিহিত উচ্চভাব ও আধ্যাত্মিকতা—যা আধু-নিক আমরা বুঝতে পারি এবং ঐ সকল গানের কাব্যিক উৎকর্ষ—যা

অনুশীলন করলে আমাদের বোঝা সম্ভব হয়—এ সব বিষয়ে ঐতিহাসিক একেবারেই নীরব। এই নীরবতা আমরা নীরসতা বলেও সন্দেহ করতে পারি।

মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এই পুস্তকখানি রচনা ক'রে আমাদের একটি অভাব পূর্ণ করবার প্রয়াস করেছেন—বস্তুগ্রাহক ঐতিহাসিক যে অভাবটি পূর্ণ করতে পারে নি। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর নিজে সঙ্গীতের সাধক এবং সৌখীন সঙ্গীত-বেত্তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে সুপরিচিত। তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তানসেনের জীবনীর উপর যে চন্দ্রিকাপাত করেছেন—তার জন্য তানসেনের জীবনের অনেক গূঢ় ও আধ্যাত্মিক রহস্য আমাদিগকে চমৎকৃত করতে পারবে—এটা আশা করি। পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁরা এই পুস্তকটিকে ভক্ত ও সাধকের শ্রদ্ধাঞ্জলি মনে ক'রে আদরে গ্রহণ করবেন। ইতি—

১১ই আশ্বিন, ১৩৪৬

২।৩এ, গোয়াবাগান লেন,

কলিকাতা।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

মিঁয়া তানসেনের কথা আর্যাবর্তের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আজও স্মরণ করে। এখনও তাঁর স্মৃতি হিন্দুস্থানে অমর হয়ে রয়েছে—বোধ করি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এই ধরাতলে যতদিন গীত হবে—রাগ-রাগিণীগুলির নাম শত রূপান্তরের মধ্যে দিয়েও যতদিন বিলুপ্ত একেবারে না হবে, ততদিন তানসেনের নাম কেউ ভুলতে পারবে না এবং জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি এমন দুর্দিন হিন্দুস্থানে যেন কখনও না আসে যেদিন তানসেনের নাম পর্যন্ত বিস্মৃতির সাগরে ডুবে যাবে। কিন্তু যতদিন হিন্দুস্থানের মাটি সম্পূর্ণ ক্ষয় না পাবে, যতদিন হিন্দু সঙ্গীত ব'লে একটা কিছু থাকবে—ততদিন তানসেন, নাদবিদ্যারূপিণী বাগ্‌-দেবীর বরপুত্ররূপে চিরদিনই কলাবিদ ও গুণীসমাজে শুধু নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সবারই অন্তরে শ্রদ্ধা ও পূজার আসনে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকেন—সঙ্গীতের হীনতম সাধক আমি আজ যুক্তকরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে এই প্রার্থনাটি শুধু নিবেদন ক'রে আমার পুস্তক আরম্ভ করতে চাই।

মিঁয়া তানসেনের সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই অনেক গল্প, আখ্যায়িকা প্রভৃতি আমরা শুনে এসেছি—কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই বেরিয়েছে—

আমি তাই তাঁর সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের ও সঙ্গীতরসিকদের হৃদয়ে সত্যকার অনুসন্ধিৎসা জাগাবার জন্য এই পুস্তক লিখছি। যাঁরা তানসেনের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য জানবার জন্য যথার্থ উৎসুক, তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে আবুল ফজল্ লিখিত আকবর বাদশাহের দরবার সম্বন্ধীয় বিবরণে কতক কতক জানতে পারবেন ও আরো বিস্তৃত সব বিবরণ জানতে পারবেন 'তুহফ্‌তুল্ হিন্দ্', 'খুলাসতুল এশ্', 'কনীজুল্ অফাদাত', 'নূরুল হদায়ক' ও পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ সাহেবজাদা সাদৎ আলি খাঁ সাহেব প্রণীত 'ফিলস্কহ মৌসিকী' নামক পুস্তক পাঠে। আমরা বহু চেষ্টায় উপরিলিখিত পুস্তকের দু'একটী যোগাড় করেছিলাম— তদভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য শাস্ত্রী প্রণীত সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক পাঠেও আমরা আমাদের বর্তমান বিষয়ের কিছু কিছু উপকরণ পেয়েছি—তানসেনের বংশধর পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের মুখে ও তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ উজীর খাঁ সাহেবের বর্ণনায়ও বর্তমান প্রবন্ধের বর্ণিত বিবরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তদ্ভিন্ন অধুনা অমুদ্রিত একটি প্রাচীন বাংলা পুস্তকেও আমাদের বিবরণের সহিত হুবহু মিল অনেক বিবরণ দেখেছি। সেই পুস্তকও সত্যানুসন্ধিৎসু জনৈক সঙ্গীতরসিক বিরচিত। সর্বোপরি All India Musical Conference-এর দিল্লী অধিবেশনে ৺সাদৎ আলি খাঁ সাহেব তানসেনের জীবনী, তাঁর বিদ্যাবত্তা ও তাঁর বংশপরম্পরা সম্বন্ধে ইংরাজীতে বিশদভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন— উৎসুক পাঠকগণ তা' পড়তে পারেন—

All India Musical Conference-এর দিল্লী অধিবেশনের বিবরণীতে তা'র সংক্ষেপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হবে।

লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ঠাকুর তাঁর 'মআরিফুন্নগমাৎ' নামক সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন "আধুনিক গান বিদ্যা কিসী সংগীত গ্রন্থকে অনুসার নহী হ্যায়্। লেকিন্ জো বিরাজ আজকাল প্রচলিত হ্যায়্, উস্‌কা প্রমাণ অগর কঁহী মিল্ সক্‌তা হ্যায়্ তো তানসেন কি খানদান সে। ইহ্ খানদান জলালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর্ আজম্ কে সময় সে অব তক্ গান বিদ্যা কো অভিজ্ঞোঁ মে অদ্বিতীয় হ্যায়।" অর্থাৎ আধুনিক গান বিদ্যার প্রমাণ মাত্র তানসেন ও তাঁর বংশাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কোনও সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান যুগের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মেলে না। এ কথাটা আমাদের খুবই মনে রাখা উচিত। আজকাল রাগ রাগিণীর যে সব রূপেব সঙ্গে আমরা পরিচিত সে সবের স্রষ্টা নারদ, ভরত, হনুমান বা কোনও ঋষি মুনি নয়। তাঁদের সৃষ্টিধারা বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক আকার লাভ করেছে। এখনকার রূপান্তরের মধ্যে যাঁর প্রেরণার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় তিনি তানসেন ভিন্ন আর কেহ নন। তানসেনও এই প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু হরিদাস স্বামীর কাছ থেকে। বর্তমান সঙ্গীতের যুগকে তানসেনের যুগ বলতে পারি। হরিদাস স্বামী অন্তরে সঙ্গীতদেবীর যে মন্ত্র ও যে ধ্যানমূর্তি সাধারণ প্রেরণায় পেয়েছিলেন, তানসেন তাই জগতের সামনে শরীরী করে তুলেছেন। স্বামী হরিদাস দেবর্ষি নারদেরই অবতার ছিলেন। তবে তাঁর সৃষ্টি ছিল ভগবৎ

পদারবিন্দে অঞ্জলি দিবার জন্য,—তানসেন সেই সৃষ্টির উৎস থেকে একটি ধারা জগতের দিকে বহিয়ে দিলেন জগৎকে সঙ্গীত-সুধাস্রোতে সুশীতল করবার জন্য। বর্তমান সঙ্গীত-মন্দাকিনীর পিতা হরিদাস স্বামী আর তানসেন ভগীরথের মত সেই প্রবাহকে আবাহন করে আনলেন সুরতরঙ্গিণী জাহ্নবীর মতই জগতের অসংখ্য তৃষিত তাপিত জনের অন্তর জুড়াতে।

আবুল ফজলের ইতিহাসে আমরা পাই, তানসেনের জন্মের পূর্বে এক হাজার বৎসরের মধ্যে তাঁর সমতুল্য গুণী ও সঙ্গীত-স্রষ্টা কেহ জন্মান নি। অবশ্য তাঁর গুরু স্বামী হরিদাসের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া নায়ক, গুণী, গন্ধর্ব যাঁরা পূর্বে জন্মেছিলেন, যাঁদের কথা তখন সবার স্মরণ পথে পড়ত, তাঁদের কেউই তানসেনের ছায়ারও তুল্য ছিলেন না এবং আবুল ফজলের ধারণা ছিল যে, সঙ্গীতের এমন নবী বুঝি দুনিয়ায় আর কোনওদিন আবির্ভূত হবে না। অথচ আমরা চাই দুনিয়ার সৃষ্টিধারা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করুক, শত তানসেন শত হরিদাস আবার হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হউন। যা ছিল, তার চেয়ে বড় কিছু আসবে না এ কথা কে বলবে?

তবে এটা সত্য যে, স্মরণাতীত কালের কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক যুগে সঙ্গীতের যে নিদর্শন সব আমরা পাই তাতে বেশ প্রতীতি জন্মে যে, স্বামী হরিদাস ও তানসেনের যুগেই সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

সঙ্গীতের যুগ-পূর্ববর্তী বহু শতাব্দীর সাধনায় হরিদাস স্বামী ও তানসেনের যুগের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তানসেনের স্থান

তানসেনের যুগ সম্বন্ধে সঠিক বুঝতে হ'লে তার পূর্ববর্তী সময় থেকে আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে। আমরা সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প ও সভ্যতার সব ক্ষেত্রেই এই সত্য লক্ষ্য করি যে, যখনই লোকোত্তর মহৎ কিছুর আবির্ভাব হয়েছে তার ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থা অত্যন্ত অবনতিসূচক মলিন ও তমোগ্রস্ত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'। সব ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। আর্টেরও যখন চরম গ্লানির অবস্থা আসে তখনই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও শিল্পীর অবির্ভাব হয়। জগতের আশ্চর্য সমস্ত সৃষ্টিরই এই রহস্য। প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন লোকেরা সেই সূক্ষ্ম জগতের শক্তিরই লীলার যন্ত্র—সূক্ষ্ম জগদ্বাসী দেববৃন্দের বাহন মাত্র।

দেবতাদের কৃপা কালসাপেক্ষ। কাল যে আসন্ন হয়েছিল তা তানসেনের জন্মের পূর্বকার ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পাই। আমি বলেছি যখনই কোনও অভাব দারুণ আকার ধারণ করে, যখন সবই অন্ধকার মনে হয়, কোথাও কোন চিহ্নই দেখা যায় না, তখনই বুঝতে হবে আশার আলো জ্বলবার আর বিলম্ব নাই। চরম অবস্থাই অভ্যুত্থান এবং পতনের পূর্ব নিদর্শন। সঙ্গীতের সব চেয়ে অন্ধকারের যুগ মোগল ও পাঠান রাজত্বের সন্ধিক্ষণ।

১৩০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পাঠান সাম্রাজ্যের অবসানে ও বৈজুবাওয়া, গোপাল নায়ক ও আমীর খসরুর তিরোধানের পর প্রায় দুই শত বৎসর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের

অনুশীলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রাণস্পন্দন প্রায় বন্ধই ছিল বলতে হবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ মানসিংহকে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা রূপে আমরা দেখতে পাই। ইনি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩১ বৎসরকাল গোয়ালিয়রে রাজত্ব করে গেছেন। ইঁহার পত্নী গুর্জর-রাজকন্যা রাণী মৃগনয়নী সঙ্গীত বিদ্যায় অসামান্যা ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিলেন।

মহারাজ মানসিংহ ও রাণী মৃগনয়নী উভয়েই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পুনরুত্থানের অগ্রদূত তাতে সন্দেহ নাই। তাঁদের উদ্দেশে রচিত বহু গান এখনও আমরা পাই। ইহা পরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

তানসেনের জীবনেও রাণী মৃগনয়নীর দান সামান্য নয়। সে কথা আমরা যথাসময়ে বিবৃত করব। মহারাজ মানসিংহ যে তানসেনের সুরের অগ্রদূত, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই। মহারাজ মান তানসেনের জন্মের দশ বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেন, রাণী মৃগনয়নী আরও বহুদিন বেঁচেছিলেন।

তানসেনের পিতার নাম মুকুন্দরাম পাঁড়ে। কেহ কেহ তাঁর নাম মকরন্দ পাঁড়েও বলেন। মুকুন্দরামও সুগায়ক ছিলেন, তিনি বারাণসীতে কথকতায় জীবিকা উপার্জন করতেন এবং পাণ্ডিত্যে ও সঙ্গীতে জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, অর্থও তাঁর ছিল প্রচুর। কিন্তু সংসারে তাঁর একটা বড় দুঃখ ছিল, তাঁর পত্নীর মৃতবৎসার দোষ ছিল। তানসেনের বা রামতনুর পূর্বেও তাঁর অনেকগুলি পুত্রসন্তান জন্মেছিল কিন্তু একটিও রক্ষা পায়নি।

রামতনুর জন্মের পূর্বে তিনি খবর পান যে, গোয়ালিয়রে হজরত মহম্মদ গওস্ নামক এক সিদ্ধ পীর আছেন, তিনি মৃতবৎসা দোষ দূর করতে পারেন। এই সংবাদ পেয়ে মুকুন্দরাম গোয়ালিয়রে যাত্রা করেন ও হজরত গওস্ তখন তাঁকে একটি কবচ দিয়ে বলেন যে, কবচটি তাঁর পত্নীকে কণ্ঠে ধারণ করতে হবে ও সন্তানের জন্মের পর সন্তানের কণ্ঠে সেটাকে দিতে হবে। তা'ছাড়া কিছু কিছু নিয়ম প্রণালীও বলে দেন এবং আভাস দেন যে, সমুদয় নিয়ম পালিত হ'লে ভাবী সন্তান রক্ষা তো পাবেই, পরন্তু সে এক অদ্বিতীয় বিভূতিশালী পুরুষশ্রেষ্ঠরূপে পরিণত হবে। এর কিছুদিন পরই (১৫০৬ খৃঃ অঃ) রামতনুর জন্ম হয়। রামতনুই মুকুন্দরামের একমাত্র পুত্র।

রামতনু বাল্যে বড় দুরন্ত ছিলেন। বালক রামতনু পাঠাভ্যাস মোটেই করেন নাই—রামতনু কেবল মাঠে, জঙ্গলে, গঙ্গাতীরে, হয়ত ক্ষেতে গরু চরিয়ে বেড়াতেন। রামতনু ছিলেন একেবারে প্রকৃতিরই আদুরে শিশু। মুকুন্দ ও তাঁর পত্নী রামতনুকে শাসন করতেন না, কেননা রামতনু তাঁদের একমাত্র ও বড় কষ্টে পাওয়া সন্তান। এইভাবে রামতনুর দশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়। বালক রামতনুর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল —যে কোনও রূপ স্বরই তিনি শুনতে পেতেন তারই অবিকল অনুকরণ তিনি করতে পারতেন, যাবতীয় জীবজন্তুর ডাক নকল করতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন ও তাঁর নকল স্বরে সবারই ভ্রম জন্মাত।

এই সময়েই রামতনুর সঙ্গে পরমভক্ত দিব্যগায়ক হরিদাস

স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। সে এক দৈব সংযোগ—এই সময় স্বামী হরিদাস শিষ্যমণ্ডলী সহ বারাণসী তীর্থ দর্শনে এসেছিলেন। তাঁরা যখন বারানসীর সীমানায় এসে পোঁছলেন, তখন সেখানে বনে রামতনু গোচারণ করছিলেন। এক অপরিচিত শিষ্য-পরিবৃত সন্ন্যাসী দেখে রামতনু কৌতুকচ্ছলে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে বাঘের ন্যায় ভয়ানক শব্দ করতে শুরু করলেন। তাতে শিষ্যরা সব ভয় পেয়ে গেল। হরিদাস স্বামী বারাণসীর কাছে বাঘের অবস্থান সম্ভবপর নয় ভেবে শিষ্যদের চারিদিকে দেখতে বললেন। শিষ্যেরা অচিরেই রামতনুকে গাছের আড়াল থেকে বের করে ফেললেন ও স্বামীজির সম্মুখে এনে হাজির করলেন। স্বামীজী বালক রামতনুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও সিদ্ধজনোচিত লক্ষণাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতার কাছে গেলেন ও তাঁকে শিষ্য করে সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন। পিতা মুকুন্দরামও তাঁর প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দান করলেন। এই সময়ই রামতনুর সঙ্গীতদীক্ষা হ'ল ও গুরু-শিষ্য উভয়েই বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। রামতনু বা তানসেনের অমর সঙ্গীত-জীবনের এইখানেই সূত্রপাত। রামতনুর বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র।

এইখানে স্বামী হরিদাসের সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার। ভক্তমাল গ্রন্থে আমরা পাই, হরিদাস স্বামী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁর সন্ন্যাসজীবনের সহিতই ইতিহাস পরিচিত—তিনি বালব্রহ্মচারী ছিলেন অথবা গার্হস্থ্যের পর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে ইতিহাসে আমরা পাই

যে, তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন ও তথায় 'বঙ্কুবিহারী' নামক এক মণিময় শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। প্রবাদ এই যে, এই মূর্তিটি মাটিতে প্রোথিত ছিল, হরিদাস স্বামী প্রত্যাদেশ পেয়ে তা' মাটি থেকে উদ্ধার করেন ও তা'র সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। হরিদাস স্বামী একজন সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন, এ কথা আমরা ইতিহাসে পাই—তাঁহার অর্থলোভ মোটেই ছিল না. নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কাম ও প্রকৃত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তিনি ছিলেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অনেকে তাঁকে দেবর্ষি নারদের অবতাররূপে কীর্তন করে থাকেন।

হরিদাসের অপ্রাকৃতী ভাবই সঙ্গীত-ধারায় বিগলিত হ'য়ে ভগবৎ পদে উৎসৃষ্ট হয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গীতও অপার্থিব এবং দিব্য গরিমায় মণ্ডিত ছিল ; তা' শ্রবণের সৌভাগ্যও খুব কম লোকেরই হয়েছিল—শুধু তানসেনই সেই অমর সঙ্গীত শ্রবণ ও শিক্ষার অধিকার পেয়েছিলেন। তানসেনের প্রতি হরিদাস স্বামীর এক অহৈতুক কৃপাই তার কারণ। এই দিব্য মহা-পুরুষের কৃপা তানসেন অতি বাল্যে, দশ বৎসর বয়সেই লাভ করলেন। বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাসের নিকট রামতনু দশ বৎসর একাদিক্রমে বিদ্যা শিক্ষা করার পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতাও তার অল্পকাল পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতা মুকুন্দরামের অন্তিম শয্যায় রামতনু উপস্থিত হন। ঐ সময় পিতা পুত্রকে শেষ কথা ব'লে যান যে, তিনিই রামতনুর একমাত্র পিতা নন, রামতনুর আর এক পিতা আছেন তাঁর নাম হজরত মহম্মদ গওস্, তিনি গোয়ালিয়রে থাকেন। মুকুন্দরাম রামতনুকে

তাঁর শেষ উপদেশ দিয়ে গেলেন যে, রামতনু হজরত গওসের পরামর্শ যেন কখনও অবহেলা না করেন।

বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে, পিতার অন্তিম আদেশ রামতনু হরিদাস স্বামীকে জানালেন ও স্বামীজির অনুমতিক্রমে হজরত মহম্মদ গওসের সাক্ষাৎলাভের জন্য গোয়ালিয়রে যাত্রা করলেন। গোয়ালিয়রে হজরত মহম্মদ গওসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মহম্মদ গওস্ রামতনুকে বললেন, "তুমি এইখানে বাস কর, আমার সব বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হও, আমি তোমার বিবাহ দিয়ে তোমায় সংসারী করে দিই।" রামতনু হজরত গওসের এই অনুগ্রহে অত্যন্ত কৃতার্থ বোধ করলেন ও কিছুদিন গোয়ালিয়রে বাস করলেন। এই সময়ে রামতনু শুনতে পেলেন যে, গেয়ালিয়রের মৃত মহারাজ মানসিংহের বিধবা পত্নী রাণী মৃগনয়নী অতি উৎকৃষ্ট গায়িকা। রামতনু রাণী মৃগনয়নীর গান শুনবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হওয়ায় হজরত গওস্ তার উপায় করে দিলেন। রাণী সাহেবার দরবারে মহম্মদ গওসের অতুল প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রাণীকে অনুরোধ করে রাজবাটীতে রামতনুর নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করলেন। রামতনু নিমন্ত্রিত হ'য়ে রাণী মৃগনয়নীর গান শুনলেন ও নিজে স্বামী হরিদাসের নিকট যা শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাও শোনালেন। রাণী রামতনুর গানে পরম সন্তোষলাভ করলেন ও প্রত্যহই তাঁকে নিমন্ত্রণ করা সুরু করলেন। মৃগনয়নীর সঙ্গীত-মন্দিরে রামতনুর নিত্য যাতায়াতে ক্রমশঃ রামতনুর হৃদয়-মন্দিরে এক নব দেবীমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা শীঘ্রই সূচিত হ'ল। রাণী মৃগনয়নীর অনেক শিষ্যা

ছিলেন—তন্মধ্যে হোসেনী ব্রাহ্মণী নাম্নী এক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিতা ব্রাহ্মণললনা সৌন্দর্যে, মাধুর্যে ও সুমধুর সঙ্গীতে রামতনুকে আকৃষ্ট ক'রে ফেললেন। উভয়েই উভয়ের প্রতি নিবিড় প্রণয়ে অভিভূত হ'য়ে, পরস্পরকে লাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।

রাণী মৃগনয়নী রামতনুকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন—হোসেনীর প্রতি রামতনুর এই প্রেমসঞ্চার সন্দর্শনে, তাঁদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করতে তাঁরও যথেষ্ট আগ্রহ হ'ল। হোসেনীর প্রকৃত নাম প্রেমকুমারী। তাঁর পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে সপরিবারে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। প্রেমকুমারী তাঁরই কন্যা। প্রেমকুমারীর ইস্‌লামী-নাম 'হোসেনী' রাখা হয় —ব্রাহ্মণকন্যা ব'লে তাঁকে সবাই হোসেনী ব্রাহ্মণী ব'লে ডাকত।

মৃগনয়নী এই প্রেমকুমারীর সঙ্গে রামতনুর বিবাহ দিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে হজরত গওস্‌কে এক পত্র লিখলেন। গওস্‌ রামতনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হোসেনীকে প্রাপ্ত হ'লে তিনি সত্যি সুখী হবেন কিনা। রামতনু তাঁর পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ও হোসেনীকে বিবাহ ক'রে জাতিচ্যুত হ'তে রাজী হ'লেন। রামতনুর সম্মতি গওস্‌ রাণীকে জানাবার পর অচিরেই উভয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। রাণী মৃগনয়নী প্রেমকুমারীর পিতাকে আহ্বান করলেন এবং নিজে বর ও কন্যা উভয় পক্ষেরই কর্ত্রী হ'লেন—হজরত মহম্মদ গওস্‌ পৌরোহিত্য সম্পাদন করলেন। এই বিবাহের পর রামতনুর নাম মহম্মদ আতা আলী খাঁ রাখা হ'ল। বিবাহ উপলক্ষে মহম্মদ আতা

আলী খাঁ রাণী মৃগনয়নী ও হজরত গওসের নিকট থেকে বিস্তর টাকা যৌতুক স্বরূপে পেয়ে বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামীর শ্রীচরণে পুনরায় ফিরে এলেন। সমস্ত ঘটনা তাঁকে নিবেদন করলেন। স্বামীজির উদার হৃদয়ে জাতিভেদ ছিল না—তিনি রামতনু ও মহম্মদ আতা আলীর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পেলেন না ও পূর্বের মতই তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ ক'রে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা সম্পূর্ণ করলেন।

হরিদাস স্বামীর উদারতায় তানসেন অন্তরে বাহিরে তাঁর চিরদিন কেনা গোলামের মতই হয়ে গেলেন—গুরুই তাঁর জীবনের একমাত্র উপাস্য ও ধ্যান জ্ঞান ছিল—জাতে মুসলমান হ'লেও গুরুমন্ত্র ও গুরুদত্ত যোগ তিনি হারাননি। স্বামী হরিদাস তানসেনকে সঙ্গীতের যৌগিক সাধনা সর্বাঙ্গীণরূপেই দিয়েছিলেন —সেই সাধনাই তানসেনকে চিরদিন কামধেনুর ন্যায় সুরের অক্ষয় রসধারা যুগিয়েছে ও কল্পবৃক্ষের মত ইচ্ছাফল প্রসব করেছে। দেবদেবীরা রাগরাগিণীরূপে মূর্তি নিয়ে তানসেনের কাছে চিরদিনই ধরা দিয়েছেন।

তানসেনের দাম্পত্যজীবনও নিষ্ফল হল না। তানসেনের রসিকা বিদগ্ধা পত্নী সঙ্গীতে সিদ্ধা ছিলেন—তাঁদের উভয়ের প্রণয় নাদবিদ্যার সেবায় দিন দিন গাঢ়তর মধুরতর হয়ে উঠল। এই সময় গোয়ালিয়রের ফকির গওসের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়ে এল। ফকির সাহেব তানসেনকে ডেকে পাঠাবা মাত্র হরিদাস স্বামী তানসেনকে অবিলম্বে গোয়ালিয়র যেতে বললেন। তানসেন ফকির সাহেবের অন্তিম দশায় অকৃত্রিম ভক্তির সহিত

তাঁর সেবা করে মরণোন্মুখ ফকিরকে তৃপ্ত করলেন ও ফকিরের শেষ আশীর্বাদ লাভ করলেন।

ফকির সাহেবের ধনরত্নের অভাব ছিল না—সে সমস্তই তিনি তানসেনকে মৃত্যুশয্যায় দান করে গেলেন। তানসেন তারপর কিছুদিন সপরিবারে গোয়ালিয়রে বাস করেন। তবে, স্বামী হরিদাসের নিকটে যোগসাধনা ও সঙ্গীত শিক্ষার জন্য নিয়মিত ভাবেই তিনি বরাবর যেতেন। হরিদাস স্বামী তানসেনকে দুইশত ধ্রুপদ শিক্ষা দান করেন ও যৌগিক সপ্তচক্রে সাত সুরের প্রকাশ যোগবলে কিভাবে সম্ভব হয়, সে সঙ্কেতও তানসেনকে দিয়েছিলেন—গুরুশক্তির প্রভাবে কালে তানসেনও নাদসিদ্ধ হলেন।

সংসার-আশ্রম ত্যাগ করে তানসেনকে সন্ন্যাসী হতে হয়নি। সংসারে থেকেই তাঁর সাধনা সফল হ'ল! সঙ্গীত সাধনাকালে তানসেনের চারি পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রদের নাম সুরতসেন, সরৎসেন, তরঙ্গসেন ও বিলাস খাঁ—কন্যার নাম ছিল সরস্বতী। এঁরা সকলেই নাদবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং উত্তরকালে সকলেই যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভ করে বংশগৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

তানসেনের সাধনা যখন পূর্ণপ্রায়, সেই সময় রেওয়ার মহারাজ রাজারাম বৃন্দাবন থেকে তানসেনকে তাঁর দরবারে নিয়ে যান—রেওয়ার সভাগায়ক রূপে তানসেন কয়েক বৎসর রেওয়ায় ছিলেন। রাজারামের নামে অনেকগুলি গান তানসেন রচনা করেছেন—তার কতকগুলি আমি জানি। রেওয়ায় কয়েক

বৎসর বাসের পর তানসেনের সৌভাগ্যরবি অকস্মাৎ উদিত হল। এই সময়েই আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন ও তাঁর সঙ্গে রেওয়া অধিপতি রাজারামের বিশেষ প্রীতি সংস্থাপিত হল। আকবর বিশেষ কার্যোপলক্ষে একবার রেওয়ায় এসেছিলেন, ঐ সময় তানসেনের সঙ্গীতে আকবরের চিত্ত বশীভূত হয়ে পড়ল। রাজারাম তানসেনকে বাদশার নিকট উপহারস্বরূপ প্রদান করলেন—বাদশা সসম্মানে তানসেনকে দিল্লী দরবারে নিয়ে গেল্লেন। (১৫৫৬ খৃঃ অঃ)।

আকবর বাদশাহকে মধ্যযুগের একজন যুগপ্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হবে না। ধর্মশাস্ত্র, তত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতি সর্ববিধ কৃষ্টির এত বড় প্রেরণা রাজা বিক্রমাদিত্যের পর ভারতবর্ষে আর কেহ দেন নাই। বাদশা আকবর বিক্রমাদিত্যেরই পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁর দরবারে এক নবরত্ন সভা স্থাপন করেন—তানসেন নবরত্নের শ্রেষ্ঠতম রত্নরূপে পরিচিত হলেন। তানসেন ভিন্ন তাঁর দরবারে আরো নিম্নলিখিত সঙ্গীতবিশারদ গুণীগণের নাম আমরা ইতিহাসে পাই : মিঁয়া খোদাবক্স, মিঁয়া মসৃনদ আলি খাঁ, বাবা রামদাস, রামদাসের পুত্র সুরদাস্, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, নবাৎ খাঁ বীণকার, বাজ বাহাদুর, কেল শশী, তানসেনের পুত্র চতুষ্টয়—সুরৎসেন, সরৎসেন, তরঙ্গসেন, বিলাস খাঁ ও তানসেনের শিষ্যদ্বয়—তানতরঙ্গ ও মানতরঙ্গ। এঁদের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তবে এঁরা ছাড়াও অসংখ্য গুণী দিল্লী দরবারে তখন প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

তানসেনের দরবার-জীবন সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ও সম-ঐতিহাসিক জনশ্রুতি আমরা শুনতে পাই—সেগুলি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তানসেন দরবারের শ্রেষ্ঠতম গায়করূপে বাদশাহের অশেষ সম্মানাস্পদ তো ছিলেনই, তা ছাড়া আকবরের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন। তানসেন ছাড়া আকবরের জীবন নীরস মরুভূমি সদৃশ—তানসেনই বাদশাহের শান্তি ও আনন্দের একমাত্র উৎস—তানসেনের সঙ্গীতই তাঁর জীবনের সারতম রসায়ন। তাই আকবর সাহ তানসেনকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না—নিশীথে শয়ন-মন্দিরে, অন্তঃপুরেও তানসেনের ছিল অবাধ গতি। প্রত্যহ শয়নকালে তানসেনের গানে বাদশার নয়ন নিমীলিত হত ও প্রভাতে পাখীর কলকূজনের সঙ্গে সঙ্গে তানসেনের গান ছিল বাদ্শার প্রভাতী মঙ্গল-আরতি। ভোরে ও রাত্রে তাই তানসেনের গান ছিল বাঁধা, তা-ছাড়া বাদশার অভিপ্রায় মত অন্যান্য সময়েও গান গাইতে হ'ত। একদিন সিংহাসনোপবিষ্ট বাদশার এমন জীবন্ত বর্ণনা তানসেন সঙ্গীতের ঝঙ্কারে মূর্তিমান করে তুললেন যে, বাদশা সেদিন আপনার কণ্ঠস্থিত মণিহার খুলে তানসেনের কণ্ঠে পরিয়ে না দিয়ে পারলেন না। আর সেদিন থেকেই তানসেনের "তানসেন" পদবী হয়েছিল। বাদশার দত্ত নামের অর্থ এই যে —যিনি সঙ্গীতের "তানের" দ্বারা "সৈন" করতে পারেন অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন তিনিই তানসেন।

আকবর বাদশার সঙ্গীততৃষ্ণা ক্রমশঃ এতই বেড়ে গেল যে,

আপনার দরবারে বা বিশ্রামভবনে শুধু তানসেনের গান শুনে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। অবশেষে গভীর রাত্রিতে তিনি ছদ্মবেশে তানসেনের আলয়ে তানসেনের মুক্ত হৃদয়ের বাঁধনহারা গান শুনতে যেতেন। একদিন এ ঘটনা তানসেন আবিষ্কার করে ফেললেন—সেদিনও আকবর তাঁকে ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের অপর একটি উপহার দান করেছিলেন।

এই সংবাদ রাষ্ট্র হবার পর অন্যান্য গুণীরা সবাই তানসেনের প্রতি দারুণ ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠলেন ও তানসেনকে কি ক'রে লাঞ্ছিত করা যায় তার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হল। তানসেন ছিলেন দিলদরিয়া লোক, ধনরত্নের মর্যাদা তাঁর কাছে ছিল না—খোস খেয়ালে তিনি চলতেন, বাদশার দেওয়া সেই হারটি হঠাৎ তিনি বেচে ফেললেন। এই সংবাদ অন্যান্য গুণীরা বাদশার কানে তুললেন। বাদশার দেওয়া উপহার বিক্রয় করে ফেলা তো সামান্য কথা নয়,—বাদশা রাগান্বিত হয়ে পরদিন তানসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সে হার কোথায়? তুমি যখন আমার দরবারে এস তখন একদিনও সে হার তোমার গলায় দেখতে পাইনা কেন? কাল যখন দরবারে আসবে তখন সে হার প'রে আসা চাই।" বাদশার এই কঠোর আজ্ঞায় তানসেন অধোবদনে বললেন, "জাঁহাপনা! সে হার আমি খুইয়েছি।" এ কথা শুনে বাদশা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন "যদি তুমি হার না নিয়ে আসতে পার তবে নিশ্চয় জেনো এ দরবারে তোমার আর স্থান নেই।"

তানসেন অতি লজ্জিত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর

ভাবনা হ'ল—এখন উপায় কি? কোথায় যাই, কোথায় গেলে এ হার অপেক্ষা মূল্যবান হার পাওয়া যায়, কেই বা দিবে আর কারই বা এরূপ দানের সামর্থ্য আছে! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর পূর্ব মনিব রাজারামের কথা মনে পড়ল।

তাঁর মনে হ'ল গুণী প্রতিপালক করুণানিধান রেওয়াধিপতি রাজারাম তাঁর প্রতি পূর্বের প্রীতি আজও নিশ্চয়ই হারান নি। সেইদিনই তানসেন নিশাযোগে রেওয়ায় যাত্রা করলেন। রেওয়ায় পৌঁছে রাজারামের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বললেন, "মহারাজ! অনেক দিন আপনাকে কিছু শুনাতে পারিনি এজন্য আজ কিছু শুনাতে এসেছি।" রাজারামকে শোনাবার জন্য এ সময় দুটি ধ্রুপদ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। একটি হচ্ছে শুক্লবেলাবলের "রাজারাম নিরঞ্জন", অপরটি মেঘ রাগের "মগন রহো রে"।

গান দুটিতে রাজারাম মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ আপনার পা থেকে রত্নময় পাদুকা দু'টি খুলে তানসেনকে দিলেন। পাদুকাযুগলের মূল্য ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

এই পারিতোষিক লাভ করে তানসেন রেওয়া থেকে পুনরায় দিল্লী যাত্রা করলেন। বিদায়ের সময় রাজারাম যখন তানসেনকে দু' বাহু প্রসারিত করে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন তখন তানসেন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তাঁকে বলেছিলেন, "মহারাজ! আজ থেকে আমার দক্ষিণ হাত আপনার। আর কাহারও অভিবাদনের জন্য এ হাত উত্থিত হবে না।"

তানসেন দিল্লী ফিরে এসে বাদশার দরবারে গিয়েই আকবরকে কুর্নিশ করলেন। বাদশার মন তখন নরম হয়ে

গিয়েছিল। আকবর তাঁকে রহস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা তা তো হ'ল, কিন্তু আমার জন্য কি এনেছ?" তখন তানসেন কাপড়ের মধ্যে থেকে সেই পাদুকাদ্বয় বের করে বাদশার সামনে দিলেন ও বললেন, "আপনার ১৮ লক্ষ টাকার হারের মূল্য শোধ হলে বাকি আমাকে ফেরত দিতে আজ্ঞা হয়।" আকবর যুগপত বিস্ময়ে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে মাথা নত করলেন, তখন তানসেন বললেন, "এই রত্নপাদুকা সাতসুরের মধ্যে একটি সুরেরও তুল্য নয়।"

আকবর বাদশা একদিন মিঁয়া তানসেনকে বলেছিলেন "তোমার গানই যখন এত মিষ্টি, না জানি তোমার গুরুদেবের গান বা আরও কত মিষ্টি। তোমার গুরুদেবের গান আমাকে শোনাতে হবে।" তানসেন বললেন, "আমার গুরুদেব যোগীপুরুষ, বনে বাস করেন, তিনি তো আপনার সভায় আসবেন না। তবে যদি তাঁর গান শোনার ইচ্ছা থাকে তবে সেখানে আপনাকেই যেতে হবে।" বাদশা তাই শুনে তানসেনের ভৃত্যের সাজ পরে গোপনে স্বামীজীর জন্য বহুমূল্য রত্ন পারি-তোষিক স্বরূপ নিয়ে তানসেনের সঙ্গে স্বামীজীর কাছে গেলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, তিনি উভয়কে দেখবামাত্র তানসেনকে সম্বোধন করে বললেন—"আরে তন্নুয়া! বাদশাকে এত্তা তগ্‌লিফ দেকর কাঁহে সাথমে লে আয়া!" বিস্ময়াভিভূত তানসেন স্বামীজীকে বাদশার আসার উদ্দেশ্য নিবেদন করলেন। স্বামীজী সম্মত হলেন এবং আনন্দচিত্তে বাদশাকে গান শোনালেন। স্বামীজীর গানে যেন রাগরাগিণীরা মূর্তি ধ'রে ধরাতলে অবতীর্ণ

হলো। বাদশা আত্মহারা হ'য়ে ধনরত্ন সব স্বামীজীকে দিতে গেলেন। হরিদাস স্বামী তখন ঈষৎ হাস্যস্ফুরিত অধরে বললেন, "ম্যয় ফকীর হুঁ—রতনমে হামারা কেয়া কাম, যব রতনই দেনে মাঙ্গো তো ইয়ে গান আঁখ বন্দ করকে শুনো, যব রতনকা দরকার দেখোগে লাগায়ে দেনা।" এই কথা বলে হরিদাস একটি গান গাইলেন, গানের প্রভাবে আকবর ধ্যাননিমগ্ন হ'য়ে যেন একটি অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগলেন—গান বন্ধ হবার কিছুক্ষণের মধ্যে সে ধ্যান ভাঙ্গে নি। অবশেষে যখন বাহিরে দৃষ্টি ফিরল তখন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন—"কুছ দেখা"? বাদশা বললেন "যমুনাজীমে এক রতনকা ঘাট বানা হ্যাঁয়, গোপিনী লোক যাতে হ্যাঁয়, পানি ভরতে হ্যাঁয়, উঠাতে হ্যাঁয় ঔর ঐ ঘাটকা এক সিঁড়িমে এক জায়গা টুটা হ্যাঁয় কৈ গির যায় ইস্ ওয়াস্তে কিসনৃজী ছুঁয়াই খাড়া হোকে খবরদার করতে হ্যাঁয়।" স্বামীজী বললেন, "ঠিক হ্যায়, আপ, হামকো যো রতন দেনে মাঙ্গা ঐ রতনসে, টুটা সিঁড়ি কো বানায় দেও।" তখন বাদশা বুঝলেন স্বামীজী যা চেয়েছেন তা পূরণ করা বাদশার কর্ম নয়। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর স্বামীজী বললেন, "আমি নিজে তো কিছু নিব না, কেলীতরে পাখীদের জন্য কিছু অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করে দিলে তাতেই আমি সুখী হব।" আকবর এই অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিঁয়া তানসেন ভৈরবরাগে সিদ্ধ ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নায়ক গোপালের বংশসম্ভূত কোনও স্ত্রীলোক তাঁকে ভৈরবরাগ শিখিয়েছিলেন। এই রাগ তিনি দরবারে গাইতেন

না; শুধু শাহ্ আকবরের নিদ্রাভঙ্গের সময় অন্দরে এই রাগ আলাপ করতেন। দরবারে কতকগুলি রাগ তিনি বেশী গাইতেন; সেগুলি 'দরবারী' রাগ নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে দরবারী কানাড়া আজও রাগবিভাগে অতি উচ্চস্থান অধিকার ক'রে আছে। তানসেন কানাড়া এত বেশী ভাল গাইতেন যে, বাদশা কানাড়াকে মিঁয়া-কি রাগ অর্থাৎ তানসেনের রাগ বলতেন। এ রাগ তিনি অন্য কোনও ওস্তাদের কাছে শুনতে চাইতেন না। তানসেন দরবারী কানাড়া ছাড়াও আরো কতকগুলি রাগে নিজ ব্যক্তিত্বের এমন প্রভাব রেখে দিয়ে গেছেন যা কখনও নষ্ট হবার নয়। উদাহরণস্বরূপ দরবারী তোড়ী, মিঁয়া-কি মল্লার, মিঁয়া-কি সারং প্রভৃতির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এ সবগুলিই "দরবারী রাগ" বা "মিঁয়া-কি রাগ"। এ সব রাগরাগিণী তানসেন ও তাঁর বংশাবলীর নিকট হ'তে এক বিশেষ রূপ ও ছন্দ পেয়ে আজও সঙ্গীত-জগতে অপূর্ব শক্তিসঞ্চার করছে।

তানসেনের সৌভাগ্য বাদশার প্রীতি অভিষেকে পুষ্পিত ও ফলিত হতে দেখে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ওস্তাদদের ঈর্ষার আর অন্ত ছিল না। তাঁরা যুক্তি ক'রে তানসেনের জীবন-নাশের এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তাঁরা বাদশাকে গিয়ে বললেন, "জাঁহাপনা! আমরা দীপক রাগ কখনও শুনি নি, আপনার অনুগ্রহে দীপক রাগ শুনে শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করতে চাই। মিঁয়া তানসেন ভিন্ন আর কেহ এ রাগ জানেন না।" বাদশা তাঁদের অভিসন্ধি বুঝতে পারেন নি। তিনি সহজ-বুদ্ধিতে তানসেনকে বললেন, "মিঁয়া! দীপক রাগ আমি কখনও

শুনি নি। আমায় তুমি শোনাও।" তানসেন বললেন যে, দীপক রাগ গাইলে তিনি মারা পড়বেন। কিন্তু কৌতূহলাক্রান্ত বাদশা কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্যা, তানসেন অনেক ভেবে পোনর দিন সময় চাইলেন।

তানসেন তাঁর সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে তার প্রতিষেধার্থ এক উপায় বের করলেন। দীপকরাগের তেজ মর্ত্যগায়ক সহ্য করতে পারে না—সুরের আগুনে শরীর পর্যন্ত জ্বলে যায়। তার প্রতিকার হ'তে পারে কেহ যদি সঙ্গে সঙ্গে সুরের শীতল ধারাসারে সে আগুন নিভাতে পারে। সুরব্রহ্মে তেজস্তত্ত্ব যেরূপ আছে, অপ্‌ও তেমনি রয়েছে; রাগভেদে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রকাশ পায়। দীপকের তেজে যেমন আগুনের সৃষ্টি হয়, মেঘরাগের দ্বারায় তেমনি বিপুল বারিধারা বর্ষিত হ'য়ে থাকে। তাই তানসেনের কণ্ঠে দীপক রাগ যখন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তখনই যদি কোনও সঙ্গীতসাধক মেঘ রাগকে আবাহন করতে পারেন তা হ'লেই তানসেনের জীবন রক্ষা পেতে পারে।

এই ভেবে তানসেন পোনর দিন ধরে তাঁর গুণবতী কন্যা সরস্বতী ও স্বামী হরিদাসের শিষ্যা রূপবতীকে মেঘ রাগ শিক্ষা দিলেন। বাদশাকেও স্বীকৃতি জানালেন যে দীপক রাগ তিনি গাইবেন।

তানসেন দীপক রাগ গাইবেন এই সংবাদ জন হ'তে জনান্তরে, দেশ হ'তে দেশান্তরে দেখতে দেখতে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। এক পক্ষ ধরে হাজার হাজার লোক দিল্লী নগরে সমবেত হ'তে লাগলো। বাদশা সেই জনমণ্ডলীর সংস্থানোপযোগী এক বিপুল অঙ্গনে

সভার আয়োজন করলেন। তানসেন দীপক রাগ গাইবেন, না জানি কি এক অলৌকিক ঘটনা ঘটবে, এই ভেবে বহু মিত্র ও সামন্ত রাজা আকবরের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

একপক্ষ পূর্ণ হ'লে তানসেন দরবারে উপস্থিত হলেন। সভায় লোকে লোকারণ্য—রাজা, উজীর, সভাসদ, সৈন্যদল ও অসংখ্য প্রজামণ্ডলী সভার চতুর্দিক ঘিরে সমাসীন। প্রভাতে সভায় তানসেন দীপক রাগের যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ওদিকে তানসেনের আদেশনুযায়ী সরস্বতী ও রূপবতী প্রভাত হ'তেই আপন গৃহে মেঘ রাগের যজ্ঞ আরম্ভ করেদিলেন। তানসেনের উপদেশ ছিল যে, তিনি দীপক রাগের অর্চনা শেষ ক'রে দীপক রাগ যখনই গাইতে আরম্ভ করবেন, সেই সঙ্গে তাঁরাও মেঘরাগের পূজা সমাপনান্তে মেঘেব আলাপ শুরু করবেন। যাতে মুহূর্তের ত্রুটিতেও কোনও বিপদপাত না হয়, সেজন্য আগেই সময়ের সঙ্কেত দেওয়া ছিল। উপযুক্ত সঙ্গীতসাধিকাদ্বয়ের উপরে এ গুরুভার দিয়ে তানসেন অনেকটা নিশ্চিন্ত চিত্তেই সভায় এসেছিলেন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় গান শুরু হবে এরূপ পূর্ব হ'তেই স্থির ছিল। যথাসময়ে যজ্ঞ ও পূজা শেষ হ'লে বাদশা সভায় আগমন করলেন। তানসেন বাদশার অনুমতি নিয়ে দীপক রাগ আরম্ভ করলেন। সভার চতুর্দিকে বহু প্রদীপ দেওয়া ছিল—তানসেন বাদশার কাছে থেকে এই অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রদীপগুলি জ্বলে ওঠামাত্র গান তিনি বন্ধ করবেন। প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গে সভাপ্রাঙ্গণে সকলেরই বোধ হল যে, দারুণ গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়েছে। তানসেনও

ঘর্মাক্ত কলেবর হ'লেন। তারপর দ্বিতীয় গীতান্তে তানসেনের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তৃতীয় গীতে গাত্রদাহ ও চতুর্থ গীতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ সব জ্বলে উঠল—সভায় দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল।

তখন রাজা বাদশা ওমরাহ প্রজাগণ যে যেদিকে পারলেন সভা ছেড়ে পলায়নে প্রবৃত্ত হ'লেন। সবাই আপন প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত। এই অবসরে অর্ধদগ্ধপ্রায় তানসেন সভা ছেড়ে নিজ গৃহে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন। দিল্লীনগরে মহা হুলস্থুল প'ড়ে গেল।

এদিকে ঘরে তানসেন-দুহিতা সরস্বতী ও সাধিকা রূপবতী মেঘ রাগের পূজান্তে রাগালাপ শুরু করেদিলেন। অর্ধদগ্ধ-প্রায় তানসেনকে দেখে রূপবতী মেঘের একটি গান গাইলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে, সূর্যদেবকে আবৃত ক'রে ফেলল—দিল্লীনগর আঁধারে ঢেকে গেল। সন সন শব্দে প্রবল বাতাস দিঙ্‌মণ্ডল ত্রস্ত ক'রে তুলল,—বিজলীর চমকে ও বজ্রের গম্ভীর গর্জনে এক আকস্মিক ঝটিকার সূচনা হ'য়ে উঠল। এই সময় সরস্বতী মেঘের দ্বিতীয় গান গাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ঘনঘটা আকাশ ছাপিয়ে বারিধারায় ধরাতল অভিষিক্ত করতে লাগল। সেই বর্ষাসারে তানসেনের দগ্ধ অঙ্গ শীতল হ'ল।

পাঠকগণ এই ঘটনাকে রূপকথা মনে করবেন না—এই ঘটনা ঐতিহাসিক ও ইহার সত্যতার বহু প্রমাণ আজো পাওয়া যায়। জড় প্রকৃতির উপরেও সঙ্গীতের প্রভাব যে কতখানি তা এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি।

দীপক রাগ গাইবার পর তানসেনের শরীর সাময়িক ভাবে

একেবারে অপটু হ'য়ে পড়েছিল, মাসখানেক তাঁকে প্রায় শয্যা-গত অবস্থায়ই কাটাতে হয়েছিল। বস্তুতঃ সরস্বতী ও রূপবতী সঙ্গীতবলে মেঘরাগ আবাহন ক'রে না আনতে পারলে তানসেনকে সেদিনই ইহলীলা সাঙ্গ করতে হ'ত। তানসেন তাই দীপক রাগ কখনও বেশী গাইতেন না। তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই রাগ অধিক অভ্যাস নিষিদ্ধ, তবে অন্যান্য রাগ শিক্ষার পর এই রাগ তাঁদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা আজও আছে। আমরা তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট এই রাগের আলাপ ও দুই তিনটি ধ্রুপদ শুনেছি। অনেকের বিশ্বাস, দীপক রাগ ভারতবর্ষ থেকে লোপ পেয়ে গেছে—কথাটা সত্য নয়।

সঙ্গীতের প্রভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা শুনলে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বলবেন এ সব গাঁজাখুরি কথা। মনোবল কি জড়প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সে তত্ত্ব বিশ্লেষণের স্থান এ নয়—তবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে ইহা প্রমাণিত করা যে দুরূহ নয়, তা যে কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের পাতঞ্জল বা তন্ত্র-শাস্ত্রে চোখ বুলিয়েছেন, তিনিই জানতে পেরেছেন। পাশ্চাত্য মনীষিরাও আজ অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্বন্ধে এতটা প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বরূপে অনেক অলৌকিক সত্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন যে, আজকের দিনে তাই এ সব কথাকে কল্পনা বলে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সত্য কথা বলতে হ'লে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অতি অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য বাদ দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবে

যাঁরা বিশ্বাস করেন না তাঁদের উপর জোর করা যেমন চলে না, তেমনি যাঁরা অতীন্দ্রিয় শক্তির কার্যকারিতায় আস্থাবান তাঁদের বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকারও কারুর নেই, এটা বলতে পারি।

দীপক রাগের অগ্নিদাহের ঘটনা ছাড়া অন্য রাগের প্রভাবেও দাবদাহের উল্লেখ আমরা তানসেনের জীবন-ইতিহাসে পাই। সঙ্গীতাচার্য ও দর্শনবিশারদ পণ্ডিত সুদর্শন শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গীত-গ্রন্থে লিখেছেন, "শ্রীহরিদাস স্বামীজীনে আকবরকো লঙ্কাদহন সারং শুনাই তো বনমে অগ্নি লগ গই, অকবর বহুৎ ডরে, তব স্বামীজিনে তানসেনজীকো মেঘ রাগ গানে কহা। ইনকে মেঘ রাগ সে বর্ষা হুই যিস্‌সে উহ্ অগ্নি শান্ত হোগই।" স্বামী হরিদাস লঙ্কাদহন রাগ গেয়ে বনে আগুন জ্বালিয়েছিলেন, পরে তানসেনের মেঘরাগে বর্ষা হওয়ায় সে দাবাগ্নি নির্বাপিত হয়। বাদশা আকবর সেখানে ছিলেন বলেই এই ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারলাম। সঙ্গীতের অলৌকিকশক্তির অপর একটি দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় জানতে পাই।

Y. M. C. A.-র বিশিষ্ট পদাধিকারী সুবিদ্বান ও হিন্দু-সঙ্গীতপ্রেমিক Rev. H. A Popley তাঁর "The Music of India নামক গ্রন্থে লিখেছেন:

"Once the celebrated Tansen was ordered by the Emperor to sing a night Raga at noon. As he sang, darkness came down on the place where he stood and spread around as far as the

sound reached." অর্থাৎ একদা বাদশা আকবর দ্বিপ্রহরের সময় মিঁয়া তানসেনকে কোন নৈশরাগ গাইতে বলেছিলেন। তানসেন সে রাগ গাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিদিকে আঁধার ঘিরে এল ও যতদূর তাঁর কণ্ঠস্বর বিস্তৃত হয়েছিল আঁধারও ততদূর ছড়িয়ে পড়েছিল।

তানসেনের জীবন বহু অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সঙ্গীত প্রভাবে তিনি বাদশার পরিবারের অনেকের কঠিন ব্যাধি অনেকবার সারিয়েছেন। তানসেন এ সব বিভূতির জন্য মোটেই অহঙ্কার করতেন না। তিনি কোনও যাদু জানতেন না, তিনি বলতেন যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে সংযোগে যখন যুক্তাবস্থায় গান গাওয়া যায় তখনই এ সব অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়। এ সবের উপর তাঁর নিজের কোনও হাত ছিল না, সবই দৈব-প্রভাবে ঘটত। এই দৈবশক্তি সিদ্ধ ফকীর মহম্মদ গওসের আশীর্বাদের ফল ও স্বামী হরিদাস প্রদত্ত যোগদীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়া যে আর কিছুই নয় তা' তানসেন বিশ্বাস করতেন।

দীপক রাগ গাইবার ফলে যখন তানসেনের কিছুদিন শারীরিক অপটুত্ব এসেছিল, তখন আকবর তানসেনের সঙ্গ না পেয়ে অন্যমনস্ক হবার জন্য মৃগয়ায় মন দিয়েছিলেন! এই সময় আর একটি দৈবসংযোগ উপস্থিত হয় যা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়।

আকবর মৃগয়ার্থে সিন্ধুদেশে গিয়েছিলেন। কিছুদিন মৃগয়ার পর একদা বাদশা সারাদিন শিকারের সন্ধানে অরণ্যে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁবু বহু দূরে, এদিকে সঙ্গের

জলও ফুরিয়ে গিয়েছিল, তৃষ্ণায় তিনি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লেন; এ অবস্থায় নিকটে কোনও জলাশয় আছে কিনা দেখবার জন্য অনুচরেরা খুঁজতে বেরুল। কিছুদূর যাবার পর তারা হঠাৎ একটি উদ্যান ও দীঘি দেখতে পেল। উদ্যানে একজন উদ্যানরক্ষক ছিল, সে তাদের প্রশ্ন করল তারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে তথায় এসেছে, তারা বলল, বাদশা আকবর মৃগয়ায় এসে পথিমধ্যে তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে পড়েছেন তাই জলের সন্ধানে তারা এসেছে। উদ্যানরক্ষক তখন যথেচ্ছ জল নিতে অনুমতি দিল। দীর্ঘিকায় উপনীত হ'য়ে তারা দেখতে পেল দীর্ঘিকার অপর প্রান্তে একটি বৃহৎ শিবমন্দির অবস্থিত। মন্দির দ্বারে একটি বীণাযন্ত্র রেখে জনৈক সাধু পূজায় রত। তারা এটা লক্ষ্য করল মাত্র, কিন্তু উদ্যানরক্ষককে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। পানীয় পাত্রে প্রচুর জল নিয়ে অবশেষে বাদশার নিকটে গিয়ে সমুদয় বিবরণ নিবেদন করল। বাদশা তৃষ্ণা নিবৃত্তির পর কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে সেই শিবমন্দিরে তখনই চ'লে এলেন। মন্দিরে উপনীত হ'য়ে দেখলেন রক্তাম্বরধারী রক্তচন্দন-চর্চিত, প্রসন্নদর্শন দীর্ঘাকৃতি জনৈক বীর-তান্ত্রিক সদ্য পূজা সমাপনান্তে বীণাযন্ত্রটির সুর মেলাচ্ছেন। বাদশা ভক্তিপূর্বক তাঁকে প্রণাম ক'রে আত্মপরিচয় দিলেন ও তাঁর যন্ত্র শুনতে চাইলেন। তান্ত্রিক সহাস্যে বীণা স্কন্ধে নিয়ে পূরবীর আলাপ শুরু করলেন।

বীণার প্রথম ঝঙ্কারেই বাদশা চমকে গেলেন। এরূপ বীণা তিনি জীবনে আর কখনও শোনেন নি। তানসেনের গান শুনে শুনে আর কারও গান শুনতেই বাদশার ইচ্ছা হ'ত না, কোনও

তন্ত্রকারের বাজনা শোনা ত দূরের কথা। কিন্তু এ বীণা শুনে বাদশার ভ্রম হ'ল যে, তানসেনের কণ্ঠ যেন কেউ কেটে বীণার সোয়ারিতে বসিয়ে দিয়েছে—যন্ত্র-সঙ্গীত যে এতদূর উৎকর্ষ লাভ করতে পারে, তা বাদশার ধারণার অতীত ছিল। যন্ত্রালাপ সাঙ্গ হবার পর, বাদশা সেই যোগীপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমটা তিনি পরিচয় দিতে চাইলেন না, পরে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বললেন, যে তাঁর নাম মিশ্রী সিং, তিনি আজমীঢ় সিংহলগড়ের ক্ষত্রিয়-নরেশ মহারাজ সমুখন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতা এই বাদশারই সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত, হৃতরাজ্য ও নিহত হবার পর তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে অরণ্যে চ'লে এসেছেন—তাঁর সংসারে আর কেহই নাই—শুধু এই বীণাই তাঁর সম্বল—শাক্তকুলে তাঁর জন্ম, অরণ্যে তন্ত্রসাধনা ও বীণাবাদনে তিনি কালযাপন ক'রে থাকেন।

এতবড় গুণী রাজার রাজ্য বাদশারই দিগ্বিজয়ের ফলে ছারখার হ'য়ে গেছে এ কথা জানতে পেরে আকবর বাদশা লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু মিশ্রী সিংজী বললেন যে, রাজৈশ্বর্যের কথা ভুলেও তাঁর মনে হয় না, অরণ্যে মহাশান্তিতে তিনি রয়েছেন। বাদশা তাঁকে দিল্লী নিয়ে যেতে চাইলেন। তাঁকে বললেন যে, রাজ্য তাঁর গিয়েছে বটে কিন্তু তিনি বাদশার দরবারে অতি সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন—মিঁয়া তানসেনের সহযোগীরূপে তিনি বাদশার দরবারে স্থান পাবেন। মিশ্রী সিংজী সন্ন্যাসী ছিলেন না—যোগী ছিলেন, তাই সংসার ত্যাগই তাঁর একমাত্র ধর্ম ছিল না। তবে নির্জন অরণ্যের শান্তিপূর্ণ আশ্রয়

ছেড়ে কোলাহলপূর্ণ রাজদরবারে যেতে তাঁর মন সরছিল না। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ বাদশার ঐকান্তিক আগ্রহ লঙ্ঘন করতে তাঁর ভরসা হ'ল না—বাদশার সঙ্গে তিনি দিল্লী গেলেন। তথায় মাসিক দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তাঁর বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট হ'ল। মিশ্রী সিংজী সম্বন্ধে আমরা যে অন্যরূপ ঐতিহাসিক বিবরণ পাই, তা নিম্নে লিখিত হ'ল।

সম্রাট আকবরের দরবারে তানসেন কণ্ঠসঙ্গীতের কোহিনূর ছিলেন সত্য কিন্তু এমন কোনও যন্ত্রী তথায় ছিলেন না যিনি বাদশার মনোরঞ্জন করতে পারতেন। যন্ত্র-সঙ্গীতের এ অভাব ও অপকর্ষ বাদশা খুবই অনুভব করতেন। একদিন তিনি তানসেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতবর্ষে এমন কোনও যন্ত্রী আছেন কিনা যাঁর বাজনা শুনে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে। তানসেন বললেন, কোনও পেশাদার ওস্তাদের সাধ্য নাই যে, বাজিয়ে বাদশাকে খুসী করতে পারে তবে একজন রাজা আছেন, তাঁকে যদি বাদশা নিমন্ত্রণ করেন তবে তাঁর বীণা শুনে বাদশা সত্যি আনন্দ পাবেন, তাঁর বীণার তুলনা নাই। তিনি হচ্ছেন সিংহলগড়াধিপতি রাজপুত মহারাজ সমুখন সিং। তানসেনের কাছে এ সংবাদ পেয়ে বাদশা মহারাজ সমুখন সিংহকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। মহারাজকে জানান হ'ল যে, তাঁর বীণার সুখ্যাতি শুনে বাদশা পরম আগ্রহান্বিত ও তাঁর বীণা শোনবার জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত, সুতরাং মহারাজকে অনুগ্রহ ক'রে দিল্লীতে পদধূলি দিতে হবে।

বাদশা আকবরের নীতিই ছিল প্রতিবেশী রাজন্যবৃন্দের

সহিত প্রণয়বন্ধন স্থাপিত করা—তাতে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যও সফল হ'ত। তিনি অনেক হিন্দু নৃপতির সহিত শোণিত সম্পর্ক সংস্থাপন ক'রে উত্তর ভারতে কি ক'রে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, তা ঐতিহাসিকমাত্রই জানেন। এ ক্ষেত্রে আকবর ভাবলেন, মহারাজ সমুখন সিংহের সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধ স্থাপনার ফলে সিংহলগড় রাজ্যটিকেও মিত্ররাজ্যে পরিণত করা যাবে। বীণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এটা হবে বাদশার ডবল লাভ।

মহারাজ সমুখন সিং মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভালরূপই জানতেন—তেজস্বী রাজপুতরাজ মোগল সম্পর্ক অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন। যবনের সঙ্গে মৈত্রী অপেক্ষা বিরোধই তিনি পছন্দ করলেন—যদিও তিনি জানতেন যে, এ বিরোধের ফল সর্বনাশ। এই সর্বনাশকে চিতোর রাজ্যের ন্যায় তিনি গৌরবময় ভাবলেন। তিনি বাদশাকে বলে পাঠালেন যে, তিনি শিবমন্দিরে পূজাসনে ব'সে মহাদেবকে যে যন্ত্র শোনান তা যবনরাজের শ্রুতিগোচর হ'তে পারে না। বাদশা ইচ্ছা করলে তাঁর রাজ্য লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু বীণা তিনি শুনতে পাবেন না।

মহারাজের এই প্রত্যাখ্যানে বাদশার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হ'ল। তিনি সদলবলে যুদ্ধযাত্রা করে সমুখন সিংকে বধ করলেন এবং যুবরাজ মিশ্রী সিংকে বন্দী করলেন। বীণা বাদনে যুবরাজ মিশ্রী সিংও পিতার তুল্যই ছিলেন। তিনি গোপনে যখন বন্দীশালায় বীণা বাদনে রত ছিলেন তখন তাঁর বীণা বাদনের দক্ষতা দেখে বাদশা তাঁকে মুক্ত ক'রে দিলেন এবং দিল্লী দরবারে অহ্বান

করলেন। কিন্তু মিশ্রী সিংজী তাতে সম্মত হন নাই। বাদশা তখন তানসেনকে তাঁর নিকটে পাঠালেন। তানসেন মিশ্রী সিংকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর ক্ষোভ দূর ক'রে তাঁকে দিল্লী দরবারে বীণালাপ করতে সম্মত করালেন। ফলে মিশ্রী সিংজী দিল্লী দরবারে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হলেন। শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত এবং স্বাধীন নৃপতির পুত্র ব'লে তিনি সম্মান ত পেতেনই—তা বাদে ভারতের শ্রেষ্ঠতম বীণাবাদক ব'লেও একটা বিশিষ্ট সম্মানও তাঁকে দেওয়া হ'ল। দরবারের গুণীমণ্ডলী একবাক্যে তাঁকে যন্ত্রসঙ্গীতের তানসেন বলে মেনে নিলেন ও মিঁয়া তানসেনও তাঁকে বাদসাহের সঙ্গীত-সভার একজন প্রধান গুণী ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন। মিশ্রী সিংজীর ভূয়সী প্রশংসা দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল। তখনকার দিনে সঙ্গীত ছিল এক পূর্ণ সঙ্গতি-বিশিষ্ট জিনিস। গীত, বাদ্য ও নৃত্য, এ সকলের সঙ্গতিকেই সঙ্গীত বলা হয়। গান, মৃদঙ্গ, বীণা ও নটনটীর নৃত্য, এ সকলের সমাবেশে সঙ্গীত তখন পেত এক অপূর্ব সামঞ্জস্য (harmony) যা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তানসেনের সঙ্গে সঙ্গতির উপযুক্ত বীণাবাদক হলেন মিশ্রী সিং। যে সঙ্গতির অভাব এতদিন বাদশার দরবারে ছিল, মিশ্রী সিংজীর আবির্ভাবে তা দূর হ'ল। তানসেনের গানের সঙ্গে সঙ্গে অতঃপর সর্বদা মিশ্রী সিং-এর বীণা বাজত তানসেন ধ্রুপদ রচনা ক'রে ঠিক যেমন ভাবে গাইতেন, মিশ্রী সিং তদনুরূপ গীত বীণায় বাজিয়ে দিতেন। এইরূপে কিছুকাল বাদশাহের সঙ্গীতসভায় এক অপূর্ব সঙ্গত চ'লল।

কিন্তু সঙ্গতের মধ্যে অসঙ্গতির সূত্রপাত হল কিছুদিন পর। ক্রমশঃ গুণের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে দ্বন্দ্বের ও প্রতিযোগিতার বৃত্তি উভয়ের মধ্যেই দেখা দিল—বিরোধ এল ঘনিয়ে। অবশেষে একদিন তানসেন ইচ্ছা করেই এমন এক তানযুক্ত গীত রচনা ক'রলেন যা বীণায় বাজানো চলে না। হাজার হ'লেও বীণার সুরের বাঁধন রয়েছে পর্দায় পর্দায়, আর গায়কের কণ্ঠ মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় গতিশীল-গলার তান যন্ত্রে কতদূর উঠবে। ফলে সেই গান মিশ্রী সিংজী বাজাতে পারলেন না। তিনি অপমানিত বোধ করলেন, যে তাঁকে জব্দ করবার জন্যই তানসেন ঐরূপ গীত রচনা করেছেন। তিনি তানসেনকে তাঁর মনোভাব জিজ্ঞাসা করলেন ও বললেন যে, ঐরূপ আচরণ সঙ্গীতে সাধুতার পরিচায়ক নয়। তানসেনও তার রূঢ় জবাব দিলেন। মিশ্রী সিং ছিলেন খড়্গধারী শাক্ত ক্ষত্রিয়, তিনি ক্রোধ সম্বরণ ক'রতে পারলেন না—কক্ষস্থিত খড়্গ নিষ্কাশিত ক'রে তানসেনের শিরোদেশে আঘাত করলেন, তানসেনের কপাল দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। অতঃপর যখন মিশ্রী সিংজীর বিচারশক্তি ফিরে এল তিনি বুঝলেন যে, কাজটা অতীব গর্হিত হয়ে গেছে, তখনই তিনি সেই তরবারি হস্তে দরবার ত্যাগ ক'রে দিল্লী হ'তে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তারপর বহুদিন তাঁর আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই আঘাত হ'তে আরোগ্য লাভ করতে তানসেনের ছয়মাস সময় লেগেছিল। এদিকে মিশ্রী সিং পূর্ববৎ অরণ্যে বিচরণ ক'রে কাল কাটাতে লাগলেন। তিন বৎসর অতীত হ'লে ঘটনাক্রমে আকবর বাদশাহের উজীর নবাব খাঁন খানার সঙ্গে মিশ্রী সিংহের

সাক্ষাৎ হ'ল। উজীর তাঁকে অভয় দান ক'রে আপন বাটীতে নিয়ে এলেন ও পরে বাদশাহকে বললেন, "মিশ্রী সিংকে পাওয়া গেছে এবং আমারই আশ্রয়ে তিনি আছেন। হুজুরের যদি আদেশ হয় তবে তাঁকে দরবারে নিয়ে আসি।" বাদশাহ মিশ্রী সিংহের সংবাদ পেয়ে খুবই হৃষ্ট হ'লেন, কেননা তৎকালে ঐরূপ বীণাবাদক আর কেহ ছিল না, কিন্তু মিশ্রী সিং আইনতঃ দণ্ডার্হ, তাই বাদশা উজীরকে এক কৌশল উদ্ভাবন করতে বললেন; তিনি বললেন, "এ কথা প্রকাশ করার আবশ্যকতা নাই, কেন না তানসেন জানতে পারলে তার (মিশ্রী সিংহের) নামে অভিযোগ আনবে। তা হ'লেই বাধ্য হ'য়ে, আইনের খাতিরে আমায় দণ্ড দিতে হবে। এখন এমন কোনও কৌশল উদ্ভাবন কর যাতে তানসেন তার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করে।" বাদশার এই মন্তব্য শুনে উজীর তানসেন ও মিশ্রী সিংহের পুনর্মিলনের উপায় চিন্তা ক'রে স্থির করলেন যে, কোনও রূপে তানসেনকে তাঁর নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে উভয়ের মিলন ঘটাতে হ'বে।

এই স্থির ক'রে তিনি রাষ্ট্র ক'রে দিলেন যে, তাঁর বাড়িতে এক সুযোগ্য স্ত্রীলোক বীণ্‌কার এসেছে। লোকপরম্পরায় তানসেনের কানেও এ খবর গেল। তিনি ব্যগ্র হ'য়ে তথাকথিত স্ত্রীলোক-বীণকারকে দরবারে আনবার জন্য বাদশার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উজীর তানসেনের সামনে বাদশাকে বললেন, "সেই স্ত্রীলোকটি পর্দানসীন, দরবারে সে কি ক'রে আসবে? তবে আপনারা অনুগ্রহ ক'রে যদি আমার বাড়িতে পদার্পণ

করেন, তবে তার বাজনা শোনাতে পারি।" এ কথায় সকলেই স্বীকৃত হ'লেন। দিন স্থির হ'ল; বাদশা তানসেন ও অন্যান্য গুণীগণ যথাসময়ে উজীরের গৃহে উপস্থিত হ'লেন। বীণাবাদন শুরু হ'ল। সকলেই একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলেন। তানসেন খানিক শুনেই বললেন, "এ স্ত্রীলোক নয়, এ আমার দুশ্‌মন"। উজীর এ কথা শুনে বললেন, "কখনো নয়। এ স্ত্রীলোক। তবে আপনি যদি মিশ্রী সিংএর কসুর মাপ করেন তাহলে পর্দা তুলে দেখিয়ে দিই।" এই সময় বাদশা ব'লে উঠলেন, "তানসেন!" তুমি মিশ্রী সিংএর জোড়া কাউকে এনে দাও, এর গর্দান আমি নিচ্ছি।" তখন তানসেন বললেন— "হুজুরের দিল্ যখন এইরূপ তখন আমিই বা কেন অসন্তুষ্ট থাকব—আমিও মাপ করছি।" তানসেন এই কথা বলার পর উজীর পর্দা তুলে স্ত্রীবেশধারী মিশ্রী সিংজীকে বাহিরে আনলেন ও তানসেনের সাথে তাঁর মিলন ঘটালেন। বাদশা আকবর তখন তানসেনকে বললেন, "এ মিলন পাকা হ'ল না, তোমার মেয়ের সঙ্গে এর বিবাহ দাও। তুমিও হিন্দু ছিলে, ইনিও হিন্দু —তুমিও গুণী, ইনিও গুণী। এঁর মত পাত্র আর কোথায় পাবে?"

বাদশার এই কথায় তানসেন সম্মত হ'লেন এবং গুণবতী কন্যা সরস্বতীকে মিশ্রী সিংহের হস্তে সমর্পণ করলেন। এই সময় থেকে মিশ্রী সিং-এর নাম নবাৎ খাঁ রাখা হ'ল (মিশ্রী = নবাৎ, সিংহ = খাঁ)। এইরূপে নবাৎ খাঁ বা মিশ্রী সিং তানসেনের নিকটতম আত্মীয়ের স্থান অধিকার করলেন।

তানসেন চারি পুত্র, কন্যা ও জামাতাসহ সুখে প্রৌঢ়-জীবন যাপন করতে লাগলেন।

মিশ্রী সিং মুসলমান নাম নিয়েও তানসেনেরই ন্যায় যোগ আরাধনাদিতে বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য এত উৎকট ছিল না। তাই মুসলমান সংস্কার নিয়েও হিন্দুরা আপন সংস্কার ও ক্রিয়া কর্ম ত্যাগ করতেন না। মিশ্রী সিংজী নবাৎ খাঁ হওয়ার পরও রক্তবস্ত্র, সিন্দূর ও খড়্গ প্রভৃতি ধারণ করতেন। তিনি তান্ত্রিকমতে সাধনা করতেন, সর্বদা খাণ্ডার বা খড়্গ ব্যবহার করতেন ও তাঁর সঙ্গীতের বাণীও খাণ্ডারবাণী ছিল। তাঁর বীণায় শক্তিপূর্ণ উদাত্ত খাণ্ডার-বাণী বাজত।

মিশ্রী সিংজী সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সুদর্শনাচার্য শাস্ত্রী লিখেছেন :—"তানসেনজীকে জামাতা নবাৎখাঁজী (মিশ্রী সিংজী) বীণাবাদনমে শ্রীহরিদাস স্বামীজিকে শিষ্য য়ে। য়ে বীণামে বড়ে প্রধান যে শরীরসে বড়ে বলিষ্ঠ যে। একদিন বাদশাহ আকবরকো রাত্রিমে বীণা শুনা রহেযে ইতনেমে বায়ুকে ঝোঁকসে মোমবত্তি বুঝ্ গই ইন্‌হোনে এক এইসি ঠোক্ বজাই কি মোমবত্তী ফির জ্বল্ উঠি। ইনকি বীণাকী ধ্বনি বহুৎ দূরতক্ শুনাই দেতিযী। নবাৎখাঁজী তি প্রথম হিন্দু যে পিছে বিবাহকি কারণ মুসলমান হুয়ে। নবাৎখাঁজী জামাতা হোনেকে কারণ তানসেনজীকে পুত্রতুল্য হী থে ইস্‌সে সম্ভব হ্যায় কি ইন্‌কে কুছ্ শিক্ষা তানসেনজীসে ভি প্রাপ্ত হুই, তো ভি য়ে প্রাধান্যেস বীণামে শ্রীহরিদাস স্বামীজিকে শিষ্য যে বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ

হুয়ে। ইন্‌কো খাণ্ডারে গোত যে।” অর্থাৎ তানসেনজীর জামাতা নবাৎ খাঁ হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনি বীণায় বড় প্রবীণ ছিলেন আর ইঁহার দেহও বড় বলিষ্ঠ ছিল। একদিন নবাৎ খাঁ বাদশা আকবরকে রাত্রিতে বীণা শুনাইতেছিলেন, এমন সময় বায়ুবেগে কক্ষস্থিত মোমবাতি নিভে গিয়েছিল, এই সময় ইনি বীণায় এমন ঠোক্ বাজালেন যে, মোমবাতি পুনরায় জ্বলে উঠেছিল। ইঁহার বীণার ধ্বনি বহুদূর অবধি শোনা যেত। নবাৎ খাঁ প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে তানসেনের জামাতা হয়ে মুসলমান হন। জামাতা হবার দরুণ তানসেনজীর পুত্রতুল্য ইনি ছিলেন এবং তদ্দরুণ তানসেনের কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবে ইনি হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁর কাছ থেকেই বীণা শিখেছিলেন। বীণায় ইনি অদ্বিতীয় ওস্তাদ ছিলেন। ইঁহার বাণীর নাম খাণ্ডারবাণী ছিল।

তানসেন-দুহিতা সরস্বতী দেবী সঙ্গীতপ্রভাবে কিরূপে তাঁর পিতার জীবন রক্ষা করেছিলেন ইতিপূর্বে আমরা তা বলেছি। তানসেনের দুহিতার ন্যায় তাঁর চারি পুত্রও সঙ্গীত-সাধনায় বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। তানসেনের বয়স যখন সপ্ততিবর্ষ উত্তীর্ণ হ'ল তখন তিনি তাঁর অন্তিম সময় নিকটবর্তী জেনে বাদশার দরবারে যাতে পুত্রদের যথাযোগ্য আসন হয়, সেই প্রার্থনা বাদশাকে জানালেন। একদিন তিনি তাঁর পুত্রদের ডেকে বললেন, “তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা কিরূপ পেয়েছ তার পরিচয় দিতে হবে। বাদশার নামে গীত রচনা ক'রে আন ও

আমায় শোনাও, তারপর বাদশার সামনে তা গাইতে হবে। বাদশা তদনুযায়ী তাঁর দরবারে তোমাদের আসন দেবেন।" পিতার আজ্ঞানুযায়ী জ্যেষ্ঠ শরৎ সেন, মধ্যম সুরত সেন, তৃতীয় তরঙ্গ সেন ও কনিষ্ঠ বিলাস খাঁ এই চারি ভ্রাতা চারিটি গান প্রস্তুত ক'রে আনলেন ও গান গেয়ে একে একে পিতাকে শোনালেন। গানের যে সকল অংশ শ্রীহীন হয়েছিল, তানসেন তা পরিপাটী রূপে সাজিয়ে দিলেন।

অনন্তর তানসেনের অনুরোধে বাদশা চারি ভ্রাতাকে আপন দরবারে গাইতে আহ্বান করলেন। নির্ধারিত দিবসে তানসেন প্রাতঃকালে পুত্রচতুষ্টয়সহ দরবারে উপস্থিত হ'য়ে বাদশাকে বললেন, "আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার শক্তির হ্রাস হয়েছে, এখন আমায় অবসর দিয়ে আমার এই চারি পুত্রের অন্নদান করতে আজ্ঞা হয়।" আকবর বললেন, "আচ্ছা, তানসেন তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।"

তখন তানসেন পুত্রদের গাইতে বললেন। প্রথমে শরৎ সেন গান আরম্ভ করলেন। তাঁর গানে গুণীগণসহবাদশা পরম প্রীত হলেন। তৎপর সুরত সেন গাইলেন। সুরত সেনের গানেও সকলেই মুগ্ধ হ'লেন। এইরূপে তরঙ্গ সেনের গানেও বাদশা সমবেত সুধীমণ্ডলীসহ সবিশেষ আনন্দ লাভ করলেন। সব শেষে বিলাস খাঁর গান হ'ল। বিলাস খাঁর গানে বাদশা ও গুণীগণ শুধু আনন্দিতই হলেন না, যৎপরোনাস্তি আশ্চর্যান্বিতও হ'লেন। বাদশা উল্লসিত কণ্ঠে বললেন যে, তানসেন ও স্বামী হরিদাসের পর এরূপ গান তিনি কখনও শোনেন নি। চৌদিকের

গায়ক গুণীবৃন্দের উচ্ছল হর্ষরোলে সভাস্থল মুখরিত হ'য়ে উঠল—সবাই একবাক্যে বললেন, "তানসেন ! এই পুত্রই তোমার কীর্তি অক্ষয় রাখবে।" তানসেন তখন বাদশাকে সেলাম করলেন। বাদশা তখন সেই চারি ভ্রাতার প্রত্যেককে সহস্র মুদ্রা ক'রে পারিতোষিক দিলেন ও প্রত্যেকের মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত ক'রে তাঁর দরবারে সম্মানিত আসন দান করলেন। তানসেনের বৃত্তি মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা নির্দিষ্ট ছিল। তানসেনকে অতঃপর অবসর দেওয়া হ'ল ও তাঁর অবসর-বৃত্তি (Pension) মাসিক সহস্র মুদ্রা স্থির হ'ল। তানসেন বাদশাকে অভিবাদন ক'রে স্বগৃহে গেলেন ও নিশ্চিন্ত শান্তিতে বিভুগুণগানে ও ঈশ্বরস্মরণে শেষ বয়স যাপন করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হ'লে বাদশার কাছে তিনিও আসতেন আবার বাদশাও তাঁর কুশলসংবাদ নিতে তাঁর গৃহে যেতেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর গত হওয়ার পর, তানসেন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ও তাঁর কালব্যাধির সূচনা হ'ল। বাদশা তাঁকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগ্রায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আরোগ্যের আর আশা রইল না। তানসেন গোয়ালিয়রে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন কিন্তু বৈদ্যগণ ভয় পেলেন, গোয়ালিয়রে যাবার চেষ্টা করলে পথেই তানসেনের মৃত্যু হ'তে পারে ব'লে তাঁদের আশঙ্কা হ'ল। তখন বাদশা তানসেনের শয্যাপার্শ্বে এসে তাঁর গোয়ালিয়র যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করতে বললেন। তানসেন বাদশাকে দেখে সাশ্রুলোচনে বললেন, "খোদাবন্দ্ ! আর কি দেখছেন ? আমার অন্তকাল সমাগত।

গোয়ালিয়রে যদি যেতে না দেন, তবে আমার সমাধি যেন তথায় হয়।" বাদশা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন। শেষ সময় আসন্ন হ'য়ে এল। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে পুনরায় বাদশা গেলেন। বাদশাকে দেখে তানসেন তাঁর শেষ গান গাইলেন। বাদশা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বালকের ন্যায় কেঁদে ফেললেন। তানসেন অতঃপর গম্ভীরভাব ধারণ ক'রে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। বাদশা বিদায় নিলেন। কিয়ৎকাল পরে তানসেন তাঁর চারি পুত্র ও শিষ্যদিগকে আহ্বান ক'রে বললেন, "আমি এখন চ'ললাম, তোমরা আমার কাছ থেকে যে সঙ্গীত সাধনা পেয়েছ আশীর্বাদ করি আমার মৃত্যুর পর এই দৈবপ্রভাবপূর্ণ সঙ্গীত তোমাদের মাঝে যেন অমর হ'য়ে থাকে। আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহ মাঝখানে রেখে চারিধারে সকল গুণী ও সাধকগণ বসে গান গাইবে। যার গানে আমার মৃতদেহের দক্ষিণ হাত উত্থিত হবে, তারই বংশাবলীক্রমে সঙ্গীত-সাধনা জাজ্বল্যমান থাকবে।" তানসেনের এই শেষ বাণীর পরেই তাঁর পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে অমৃতধামে প্রয়াণ করল (ইংরাজী ১৫৮৫ খৃঃ অব্দ, ফেব্রুয়ারী ; বাংলা ৯৯২ সন ফাল্গুন মাস)। মৃত্যুকালে তনেসেনের বয়স আশী বর্ষ হয়েছিল। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর ভক্ত শিষ্যগণ ও অন্যান্য সঙ্গীতসাধকগণ তাঁর মৃতদেহ পরিবেষ্টন ক'রে একে একে গান গাইতে লাগলেন। জনৈক য়ুরোপীয় রাজদূত তথায় উপাস্থিত ছিলেন। মৃতদেহের হস্ত যে উত্থিত হ'তে পারে এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি! বস্তুতঃ কাহারও গানেই এ

অসম্ভব সাধিত হ'ল না—পরিশেষে তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ সেই য়ুরোপীয়কে সম্বোধন ক'রে "কোন্ ভ্রম ভুলোরে মন অজ্ঞানী!" তোড়ি রাগিণীর এই ধ্রুপদটি গাইলেন। তাঁর গীতের সঙ্গে সঙ্গে মৃত তানসেনের দক্ষিণ হস্ত উত্থিত হ'ল। য়ুরোপীয় দূত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন ও তখন সকলেই বিলাস খাঁকে তানসেনের সাধনার যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে বরণ ক'রে নিলেন।

গীতশেষে মহাসমারোহে তানসেনের মৃতদেহ গোয়ালিয়রে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তথায় হজরত মহম্মদ গওসের সমাধির নিকটে তাঁর দেহ সমাহিত হ'ল। আকবর শাহ্ সমাধির উপরে একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত ক'রে দিলেন। সেই চন্দ্রাতপ আজও রয়েছে। তানসেনের সমাধির নিকট একটি তেঁতুল গাছ জন্মেছিল। সেই গাছ আজ পর্যন্ত রয়েছে। গায়কগুণীদের বিশ্বাস সেই তেঁতুল গাছের পাতা খেলে কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়।

মিঁয়া তানসেনের জীবন সম্বন্ধে আমরা যতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি পুর্বেই তা বর্ণন করেছি। হিন্দুসঙ্গীতের সুপ্রাচীন উৎকর্ষের যুগে, হিন্দুরাজত্বকালে সঙ্গীতের স্বরূপ কি ছিল তা আমরা জানি না। তবে আবুল ফজল বলেছেন, তানসেনের জন্মের সহস্র বৎসর পুর্বে থেকে সারা ভারতের সমস্ত অতীত ইতিহাসের আলোচনা করলেও তাঁর সঙ্গীতের তুলনা মিলে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐতিহাসিক ভারতে বিশেষতঃ আর্যাবর্তে তানসেনই সঙ্গীতজগতের একচ্ছত্র সম্রাট—এক্ষেত্রে স্বামী হারদাসের কথা আলোচনাযোগ্য নয় কেননা তাঁর সঙ্গীত মর্ত্য-

বাসীদের জন্য ছিল না, সে ছিল "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।"

তানসেনের গান সম্বন্ধে জনৈক হিন্দুস্থানী কবি গেয়ে গেছেন যে, বিধাতা সর্পের কান না দিয়ে ভাল করেছেন নতুবা তানসেন-জীর তান শুনে অনন্তনাগের মাথা দুলে উঠত, মেদিনী ছারখার হয়ে যেত—'ভলো ভয়ো যো বিধি না দিয়ে শেষনাগকে কান' —তানসেন কবিদের কল্পনার মানসলোকেও রহস্য-গরিমামণ্ডিত আসন অধিকার করে আজো রয়েছেন। বোধ করি তাঁর সে আসন চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

তানসেনের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে রাজা মান ও তাঁর পত্নী মৃগনয়নী হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে নবপ্রাণ আনবার চেষ্টা করছিলেন, আমরা পূর্বে একথা বলেছি। অপর এক দম্পতির কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হচ্ছেন—পাঠানরাজ রাজবাহাদুর ও তাঁর হিন্দু নটীপত্নী রূপমতী; তাঁদের বিচিত্র মধুর প্রেমলীলা বহু হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে বিবিধ রাগরাগিণীতে নিবদ্ধ রয়েছে। অনেক কবির কাব্য ও অনেক শিল্পীর চিত্র তাঁদের প্রণয় কাহিনী থেকে প্রেরণা পেয়েছে।

বলা বাহুল্য এঁদের সঙ্গীত তানসেনের বিশ্ববিজয়ী সঙ্গীতের অগ্রদূত। তানসেনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অকস্মাৎ একযোগে উদিত হ'তে দেখি সঙ্গীত সৌরাকাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য জ্যোতিষ্মান গ্রহ উপগ্রহ—তানসেন যাঁদের মাঝখানে আদিত্যের ন্যায় দীপ্তি পেয়েছেন।

তানসেনকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক আমরা ব'লে থাকি।

তাঁর সমসাময়িক যত গুণী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রথমটা তানসেনের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হ'লেও, পরে সকলেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার তো করলেনই, শিষ্যত্বও গ্রহণ করলেন। তানসেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুপদী রীতিকে পরম গৌরব ও মহিমা দান ক'রে গিয়েছেন। প্রাচীনতর যুগে উচ্চ সঙ্গীতকে "প্রবন্ধ" বলা হ'ত। যথাযোগ্য "ছন্দে" গীত "প্রবন্ধ"কেই উচ্চ সঙ্গীত বলা হ'ত। এই "প্রবন্ধ" সকল অধিকাংশ সংস্কৃত বা প্রাকৃতে রচিত ছিল। পাঠানযুগে নায়ক গোপাল "ছন্দ-প্রবন্ধে" অদ্বিতীয় ছিলেন ও নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন। তবে তিনি ও তাঁর সমসাময়িক সঙ্গীতবিদ বৈজু বাওরা, ছন্দ-প্রবন্ধ থেকে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের প্রচলন করেন। এরূপে ধ্রুপদের প্রথম আদর্শ পরিচয় আমরা নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরার যুগেই প্রথম পাই। তার দুই তিন শত বৎসর পর রাজা মান প্রভৃতি ধ্রুপদী রীতির মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের পুনরুত্থানের পথ দেখালেন। স্বামী হরিদাস ও তানসেন ধ্রুপদকে পূর্ণ পরিণতি দান করলেন। ধ্রুপদই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি প্রেরণা ও তার অন্তর প্রবাহিণী জীবনধারা। তাই তানসেনকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি পুরুষ ও পিতা বলতে আমরা অকুণ্ঠিত।

তানসেন সঙ্গীত প্রভাবে সারা ভারত ছেয়ে ফেলেছিলেন। অসংখ্য সঙ্গীত সাধক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যে সকল গুণী তাঁর চরণতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার মধ্যে প্রধান যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। যথা—খোদাবক্স, মসনদ আলী খাঁ, রামদাস, সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, মামুদ খাঁ,

খাণ্ডেরাও, সুন্দীবর খাঁ, চাঁদ খাঁ, সুরয খাঁ, রমজান, লাল খাঁ, নিজাম খাঁ, হোসেন খাঁ, শোভা খাঁ, বীরমণ্ডল, মলিল খাঁ, চঞ্চল শশী, ভীমরাও তাজবাহাদুর, ভগবান দাস, চণ্ডলাল ও দেবীলাল।

ইঁহারা সকলেই অসাধারণ গুণী ছিলেন। তবে তানসেনের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন তানতরল ও মানতরল। তানতরল ও মানতরলকে তানসেন পুত্রবৎ দেখতেন। তানতরলের বংশাবলী আজও পশ্চিম ভারতে বিদ্যমান। তবে শিষ্যগণ অপেক্ষা তানসেনের পুত্রগণ (শরৎসেন, সুরতসেন তরল সেন ও বিলাস খাঁ) ও জামাতা মিশ্রী সিংজী সঙ্গীত সাধনায় যে অধিকতর অগ্রসর ছিলেন, তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই!

উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান যে সকল সঙ্গীতগুণীবংশ আজো বিদ্যমান, তাঁদের পুর্ব পুরুষ বা পুর্বাচার্যগণ কেহই তানসেনের শিক্ষা বা প্রভাবের বহির্ভূত নন। হিন্দুস্থানের যাবতীয় গায়ক, তন্ত্রকার ও সঙ্গীতের সর্ববিভাগের সকল গুণীগণ তানসেনের বিদ্যারই কিছু না কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। তানসেনের সঙ্গীতই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া আজকের এই বহুলবিচিত্র হিন্দুস্থানী সঙ্গীতরূপে বিকাশিত হ'য়ে উঠেছে।

তানসেনের সঙ্গীত সূর্যরশ্মির ন্যায় নির্বিচারে চতুর্দিকেই বিকীর্ণ হয়েছিল তবে আধারভেদে কোথাও তা উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হয়েছে, কোথাও বা মলিন হ'য়ে গেছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, তানসেনের শেষ প্রত্যাদেশ অনুযায়ী সাধন পরীক্ষায় শুধু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ সাফল্য লাভ

করেছিলেন। বস্তুতঃ তানসেনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিলাস খাঁর বংশাবলীতেই তানসেনের সাধনা এ যুগ অবধি মূর্ত ও জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে এসেছে। তানসেনের দুহিতা সরস্বতী দেবী ও তাঁর স্বামী মিশ্রী সিংজীর বিবরণ আমরা পূর্বে বলেছি। তাঁরাও সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে আর্যাবর্তে বিলাস খাঁ ও মিশ্রী সিংজীর বংশেই নাদবিদ্যা সাধনপ্রভাবে এ যুগ পর্যন্ত জীবন্ত ও উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা বিশদরূপে লিখব।

তানসেন কণ্ঠসঙ্গীতে ও মিশ্র সিংজী যন্ত্রসঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন ইহা আমরা পূর্বে দেখেছি। বিলাস খাঁর বংশাবলীতে তানসেনের সাধনা ও মিশ্রসিংজীর বংশে বীণাসাধনা বংশপরম্পরাক্রমে চলে এসেছে। তবে এই উভয় বংশের বিদ্যা পরস্পর সংযোগে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। বিলাস খাঁর বংশধরগণ কালক্রমে তন্ত্রসাধনায়ও অশেষ সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, অপর দিকে মিশ্রসিংজীর পত্নী সরস্বতী দেবীর কণ্ঠসঙ্গীতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি নিবন্ধন তাঁর বংশীয় বীণাকারগণও কণ্ঠসঙ্গীতে প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। উভয় বংশেই কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সিদ্ধ অনেক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন।

তানসেন নিজে গায়ক হলেও যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর দান বড় সামান্য নয়। রবাব বা রুদ্রবীণা তাঁর প্রতিভাপ্রসূত। তানসেনের এই অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর বংশাবলীতে যন্ত্রসঙ্গীতের এমন একটা নূতন ধারা এনেছে যা প্রাচীন ভারতের বীণাকরণেও পাওয়া যায় না। তানসেন নিজেও রবাব উৎকৃষ্ট বাজাতেন।

মনীষী Rev. Popleyও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন—রবাব সম্বন্ধে তিনি The Music of Indiaয় লিখেছেন, "The great Tansen played this instrument. It is a handsome instrument and has a very pleasing tone, fuller than that of the Sarangi ; it leads itself to the graces better than the sitar as it has no frets."

Rev. Popley তানসেনের বংশধরদের সম্বন্ধে লিখেছেন —"The descendents of Tansen divided themselves into two groups :—The Rababiyas and the Binkars. The former used the new instrument Rabab, invented by Tansen, while the latter used the Vina or Bin. Two descendents of these were living at Rampur, a state which has been famous for many centuries for its excellent musicians. The representative of the Binkars was Mahamad Wazir Khan whose paternal ancestor was Niamat Khan Shah Sadarang at the court of the Emperor Mahammad Shah & Mahammad Ali Khan was the representative of Rababiyas......Tansen was a great Dhrupad singer and Rampur is the home, to-day, of some of his celebrated descendents who are experts at this style of singing."

Popley সাহেব তানসেনের বংশধরদের রবাবী ও বীণকার

এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, রবাবীদের মূল পুরুষ তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ, ও বীণকারদের আদি প্রবর্তক তানসেনের জামাতা মিশ্রী সিংজী। ভারতের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রালাপ এই দুই বংশ থেকেই বেরিয়েছে। মিশ্রী সিংজীর ইতিহাস আমরা পূর্বেই বলেছি। তাঁর প্রবর্তিত সঙ্গীত ও তন্ত্রে বিচিত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ সমৃদ্ধ সত্ত্বরাজসিক প্রতিভার পরিচয়ই আমরা পাই। অপরদিকে বিলাস খাঁর সাত্ত্বিক প্রতিভা থেকে যে সঙ্গীত সাধনা কুলপরম্পরায় চলে এসেছে তা'র অনাড়ম্বরতা ও নিরাভরণ শান্ত সৌন্দর্য আমাদের স্পর্শ করে থাকে। উভয়ের আদর্শই মহান এবং গরিমামণ্ডিত। সুতরাং রবাবী ও বীণকার এ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতম তা নির্ণয় করার সাধ্য নাই।

মিশ্রীংসিংজীর সঙ্গে তানসেনদুহিতা সরস্বতী দেবীর পরিণয় সঙ্গীতরাজ্যে যে এক অভিনব সার্থকতা এনেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মিশ্রী সিংজীর উদ্ধত ও উন্নত প্রতিভা সরস্বতী দেবীর বর্ণবিলাসবিচিত্র, ললিত, মনোহর, সঙ্গীত-সুষমার সংযোগ যে বীণাকরণ ও ধ্রুপদবাণীর সৃষ্টি করেছিল তাতে শক্তি ও সৌন্দর্যের, তীব্রতা ও কমনীয়তার এক অপূর্ব সমাবেশ দেখে আমরা আজও পুলকিত ও মুগ্ধ হই। এই সার্থক পরিণয়ের ফলেই শা সদারঙ্গ, নির্মল শা ও উজীর খাঁর ন্যায় সঙ্গীতের যুগ-প্রবর্তকদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল।

বিলাস খাঁর সঙ্গীত সাধনার ধারা কিছু অন্যরূপ ছিল। তিনি মিশ্রী সিংজীর ন্যায় কর্মযোগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন

অরণ্যবাসী, উদাসীন, সুরের সন্ন্যাসী। তিনি বিবাহ করেছিলেন সত্য, ভারত সঙ্গীতের মেরুদণ্ডস্বরূপ বিরাট প্রতিভাবাহী সাধক বংশের তিনি জনক সত্য, তবু তাঁর জীবন সংসারের জন্য ছিল না, তিনি ছিলেন একান্তই আরণ্যক, নিঃসঙ্গ যোগী। তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা দরবারে গাইতেন ও বাদশার কাছে প্রচুর পারিতোষিক পেতেন, কিন্তু বিলাস খাঁর অর্থ প্রতিপত্তির দিকে কোনও খেয়ালই ছিল না। সাধনায় তিনি ছিলেন তন্ময়। সখের মধ্যে গোচারণ ছিল তাঁর অবসর বিনোদনের প্রধান উপায়। বৃন্দাবনের গোপবালকদের ন্যায় তিনি ছিলেন সরলাত্মা, পবিত্র ও ঈশ্বরের পরম কৃপাভাজন।

পরিবার পরিজনের প্রতি তাঁর কোনও দৃষ্টিই ছিল না। তাই তাঁহার সহধর্মিণীকে অনেক সময় ক্লেশে পড়তে হত। একদা তাঁর পত্নী তাঁকে বললেন যে, তাঁর ভ্রাতারা ও ভ্রাতৃবধূরা কত সুখে ও ঐশ্বর্যে রয়েছে, আর তাঁর নিজের ও নিজ পরিবারের দৈন্যের অন্ত নেই—এত উদাসীনতা কি ভাল? বিলাস খাঁ তাই শুনে বহুদিন পরে বাদশার দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। বাদশা ফকীর বিলাস খাঁকে হঠাৎ আবির্ভূত দেখে পরম সমাদরে তাঁকে গ্রহণ করলেন ও তাঁর গান শুনে এত আহ্লাদিত হলেন যে, তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা দরবারে বহু বৎসর গান গেয়ে যে অর্থ পেয়েছিলেন, সেই পরিমাণ অর্থ তখনই বিলাস খাঁকে পারিতোষিক স্বরূপ দান করলেন।

বিলাস খাঁ সহস্র সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করে, সেই

টাকা তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে পুনরায় অরণ্যে চলে গেলেন। আর কখনও তিনি সংসারে ফেরেন নি।

বিলাস খাঁ সাহেব রবাব ও বীণা এবং নাদ-সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ বৈরাগী ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। আজও তিনি সারা ভারতে পূজিত, তাঁর তুল্য মহাত্মা ও সাধুপুরুষ সঙ্গীতজগতে খুবই বিরল। তিনি একপ্রকার তোড়ী রাগিণী সৃষ্টি করে গেছেন—বিলাসখানি তোড়ী নামে তা আজও গীত ও বাদিত হয়। বিলাসখানি তোড়ী এক আশ্চর্য ও জনপ্রিয় রাগিণী।

ভারতবর্ষে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা এ সবই অধ্যাত্ম-সাধনার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই ভারতের কবি, গায়ক ও শিল্পীদের জীবনে অধ্যাত্মপ্রভাব আমরা চিরদিনই দেখে এসেছি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক স্বামী হরিদাস সিদ্ধকোটির অন্তর্গত ছিলেন, বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির পার্শ্ব-স্থানীয় নারদাদির ন্যায় নিত্যসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তানসেনও অতি উন্নত সাধক ছিলেন আমরা দেখেছি। তানসেনের বংশধরগণ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে একটী সুপ্রাচীন সাধনধারা বহন করে এনেছেন।

পাঠকদের অবগতির জন্য তানসেনের পুত্রবংশ ও দৌহিত্র-বংশের বিস্তৃত বংশ-তালিকা এক্ষণে আমরা প্রকাশিত করছি।

তানসেন বংশের পরবর্তী গুণীগণ

তানসেনের পুত্রবংশ (রবাবীবংশ)
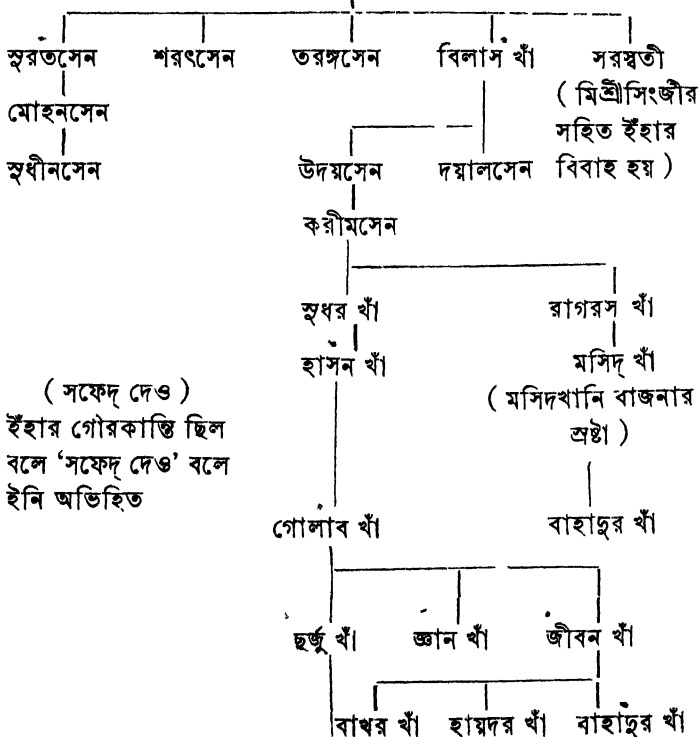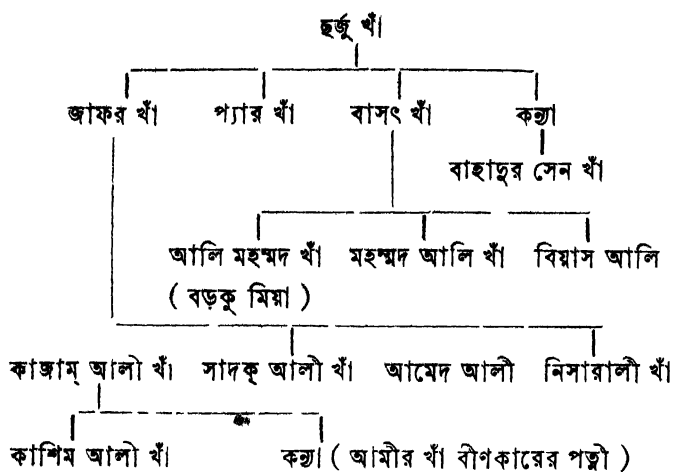
তানসেনের দৌহিত্র বংশ (বীণকার বংশ)
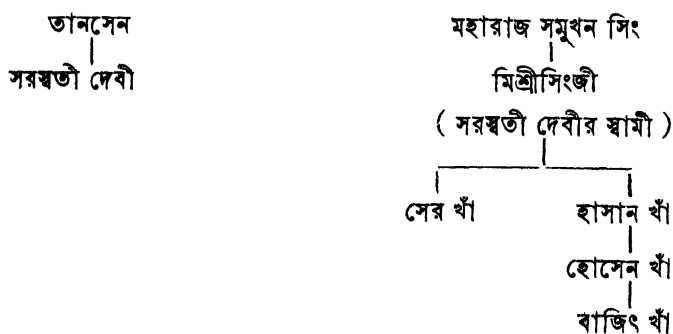
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান
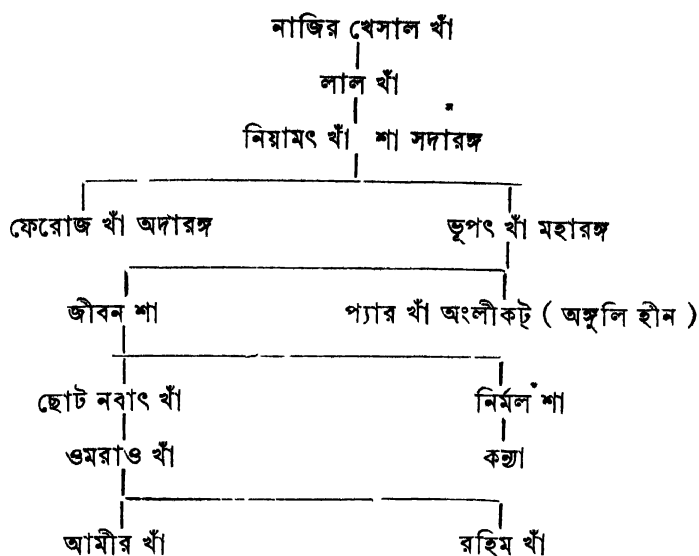
(আমীর খাঁ রবাবী কাশিম আলী খাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন)
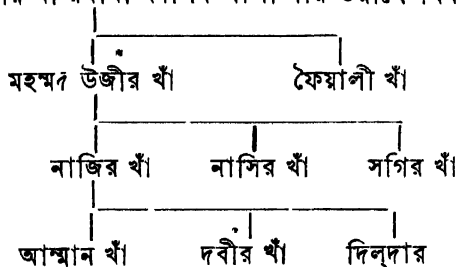
তানসেন-বংশীয় পরবর্তী গুণীগণের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আমরা একবার "কাওয়ালি" সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে নিতে চাই। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুই শতাব্দী পূর্বে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে নায়ক গোপাল ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন —তিনি "ছন্দপ্রবন্ধ" গাইতেন—ধ্রুপদ গানের সূচনাও তাঁর সময় থেকেই হয়। সঙ্গীতের সন্ন্যাসী বৈজু বাওরাও তাঁরই সমসাময়িক। বৈজু বাওরা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকালয়ে অধিক সময় থাকতেন না ও বাদ্‌শার দরবারে তাঁর উপস্থিতি খুবই দুর্লভ ছিল। নায়ক গোপালই তখন দরবারের রত্নস্বরূপ ছিলেন ও বিদ্যাপ্রভাবে নিখিল গুণীমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। পরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জনৈক পারস্যদেশীয় অভিজাতবংশীয় গুণী পাঠান দরবারে আবির্ভূত হন। এই পারস্যদেশীয় গুণীর নাম 'আমীর খস্‌রু'। আমীর খস্‌রু উৎকৃষ্ট গায়ক ও নানা বিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন—কাল-ক্রমে ইনি আলাউদ্দিনের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন ও বিশিষ্ট অমাত্য পদ লাভ করেন। ইনি শ্রুতিধর ছিলেন। একদিন দরবারের অন্তরাল থেকে নায়ক গোপালের সব রাগরাগিণী শুনে পরে প্রকাশ্য সভায় নায়ক গোপালকে সেই সকল রাগ-রাগিণী হুবহু শুনিয়ে দিলেন ও উপরন্তু পার্‌সী কতকগুলি রাগের সহিত এ রাগের মিশ্রণে কয়েকটী নূতন রাগ রচনা ক'রে নায়ক গোপালকে শুনালেন। সেইদিন হ'তে দরবারে আমীর খস্‌রুর প্রধান আসন হ'ল।

আমীর খস্‌রু হিন্দু সঙ্গীতে পার্‌সী প্রভাব এনেছিলেন। রাগ রাগিণী গঠনের এক অভিনব প্রণালী তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আমাদের ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বদলে তিনি রাগের "বাইশ মোকাম" বা দ্বাবিংশতি প্রকার বিভাগ ক'রে গেছেন। তাঁর পদ্ধতিকে 'কাওয়ালি' পদ্ধতি বলা হয়। এই কাওয়ালি রীতি অনুযায়ীই 'খেয়াল' গাওয়া হ'য়ে থাকে—আমীর খস্‌রুই খেয়ালের জন্মদাতা। তাঁর উদ্ভাবিত রাগিণীগুলির মধ্যে "ইমন্‌" রাগিণী আজও এদেশে গায়কগণের বিশেষ প্রিয়। তিনি ভারতীয় "হিন্দোল" রাগ ও পার্‌সী "মোকাম" রাগ সম্মিলিত করে "ইয়ামন" বা "ইমন্‌" রাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন। আমীর খস্‌রু কণ্ঠসঙ্গীতে যেমন "খেয়াল" গানের সৃষ্টি করে-ছিলেন তেমনি যন্ত্রসঙ্গীতেও "সেতার" যন্ত্রের উদ্ভাবন করে-ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর সুদর্শন শাস্ত্রীর গ্রন্থে আমরা পাই, আমীর খস্‌রু তিন তার জড়িয়ে সেতার যন্ত্র প্রথম তৈরী করেছিলেন। পার্‌সী ভাষায় তিন সংখ্যাকে "সহ্‌" শব্দে অভিহিত করা হয়। তিন তার বিশিষ্ট ব'লে এই যন্ত্রের নাম, আমীর খস্‌রু "সহ্‌-তার" বা সেতার রেখেছিলেন। আমীর খস্‌রু সেতারে গৎ তোলার প্রচলন করেন, তখনও সেতার যন্ত্রে আলাপ বাজাবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই। খেয়াল গান ও সেতার বাজানা-কেই "কাওয়ালি" সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে।

আমীর খস্‌রুর ঐতিহাসিক বিবরণ Rev. Popley দিয়েছেন :

"Amir Khasru was a famous singer at the

court of Sultan Allauddin (A. D. 1295-1316). He was not only a poet and musician but also a soldier and statesman and was a minister of two of the Sultans. The "Kawali" mode of singing—a judicious mixture of Persian and Indian models was introduced by him. ...The Sitar, a modification of the Vina, was first introduced by him."

আমীর খস্রুর প্রবর্তিত কাওয়ালি সঙ্গীত কিন্তু পরে রাজা মান, স্বামী হরিদাস ও তানসেনজীর প্রবর্তিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের কাছে এতই নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছিল যে বহু শতাব্দী পর্যন্ত কোনও সত্যকার রসস্রষ্টা খেয়াল গান বা সেতারের দিকে মোটেই আকৃষ্ট হন নি। ধ্রুবপদ যদ্দ্বারা লাভ হয়, তাকেই "ধ্রুপদ" বলা হয়। ধ্রুপদ সঙ্গীত আমাদের সুপ্রাচীন অধ্যাত্মসাধনার গভীর প্রেরণা অনুসরণ ক'রে চলেছিল। "কাওয়ালী" গানের সঙ্গীতকে "খেয়াল" বলা হ'ত—কেন না তাতে অধ্যাত্মপ্রেরণা ছিল না কিন্তু সরস কল্পনাবৃত্তির খেলা ছিল। ধ্রুপদীগণকে "মিষ্টিক" ও খেয়ালীদিগকে "রোমাণ্টিক" বলা যেতে পারে।

তানসেনের বংশধরগণও চিরদিনই এই মিষ্টিক সঙ্গীতেরই অনুসরণ ক'রে চলে এসেছেন। এজন্য তাঁদের "কলাবিদ্" বলা হ'ত, কারণ তাঁরা "কলা-বিজ্ঞানসম্পন্ন" ছিলেন। কলাবিদ্যা বলতে শুধু Art বুঝায় না। আমাদের শাস্ত্রে "কলাবিদ্যা"র অর্থ আরো গভীর। "কলা" মানে শাস্ত্রে "শক্তি" বুঝিয়েছে। পরা প্রকৃতিই এই শক্তি। সৃষ্টির আদি কারণস্বরূপিণী মহাশক্তি

নাদরূপে জগতের বিকাশ করেছেন। নাদ দ্বিবিধ—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক নাদ হ'তে বেদ বা অপৌরুষেয় মন্ত্রের উৎপত্তি—ধ্বন্যাত্মক নাদ হ'তে সপ্তস্বর ও রাগরাগিণীর উৎপত্তি। এই নাদবিদ্যাকেই কলাবিদ্যা বলা হয়। তাই "কলাবিদ্" হ'তে পারা যে গভীর সাধনাসাপেক্ষ তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তানসেন একজন প্রকৃত কলাবিদ্ ছিলেন—তাঁর বংশধরগণও কলাবিদ্যারই উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরে দেখলেন যে, এই বিদ্যার অধিকারী সর্বসাধারণ হ'তে পারে না। অথচ সর্ব-সাধারণকে সঙ্গীত শিক্ষা তাঁদের দিতে হ'ত। তাই ধ্রুপদ সঙ্গীত ও বীণা বা রবাব উন্নত অধিকারীদের জন্য রেখে সাধারণের জন্য তাঁরা খেয়াল বা সেতারের প্রচার করলেন। বিলাস খাঁ বংশীয় মসিদ খাঁ ঔরংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লী দরবারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেতারের তার বাড়িয়ে ও তাতে চিকারির তার বসিয়ে ধ্রুপদ-ভাঙ্গা বিলম্বিত গৎ সেতারে প্রচলিত করলেন। বীণার দীর্ঘ মীড় খণ্ড খণ্ড ক'রে সেতারের উপযুক্ত এক প্রকার আলাপ-রীতি সৃষ্টি করলেন ও তানতরঙ্গবংশীয় "সেনী"দিগকে সেতার শিক্ষা দিলেন। এইরূপে "মসিদখানি বাজনা"র উৎপত্তি হল। তবে বলা বাহুল্য সেতারের বাজনা মসিদ খাঁর নিজ বংশীয় কোনও গুণী অবলম্বন করেন নি। তাঁরা শিষ্যদের জন্যই উক্ত পদ্ধতি প্রবর্তিত ক'রেছিলেন। মসিদ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁও উৎকৃষ্ট বহু গৎ রচনা ক'রে গেছেন।

আমীর খসৃরু প্রবর্তিত সেতার যন্ত্রের প্রচার ও উন্নতি সাধন যেমন মসিদ খাঁ করলেন তেমনি আমীর খসৃরুর উদ্ভাবিত খেয়াল

সঙ্গীতের নূতন প্রাণ দিলেন—নিয়ামৎ খাঁ শাহ সদারঙ্গ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঁহারা কেহই কাওয়ালী সঙ্গীতের অনুসরণ ক'রে আপন শিল্প-প্রতিভার প্রকাশ করেন নাই। ইঁহারা উভয়েই ধ্রুপদী ও বীণকার ছিলেন—কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য কাওয়ালী সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রচার করেছিলেন। এ থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, ধ্রুপদী ইচ্ছা করলে খেয়ালকে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু কোনও খেয়ালী ধ্রুপদের কোনও নূতন মার্গ দেখাতে পারেন না। ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের স্বীকার না ক'রে উপায় নাই।

শা সদারঙ্গের পৈতৃক নাম নিয়ামৎ খাঁ। তিনি তানসেনের দৌহিত্রী বংশীয় লাল খাঁর পুত্র ছিলেন এবং পূর্বপুরুষক্রমাগত বীণাবাদনতত্ত্বে পরম বিশারদ ছিলেন। পূর্বেই আমরা দেখেছি তানসেনের পুত্রবংশে রবাব যন্ত্র ও দৌহিত্রবংশে বীণাবাদন প্রচলিত ছিল। নিয়ামৎ খাঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। তখন তানসেনের পুত্রবংশীয় গোলাব খাঁ দিল্লী দরবারে অতি সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও বাদশাহ মহম্মদ শাহের সঙ্গীতগুরু ছিলেন। গোলাব খাঁ মুখ্যতঃ গায়কই ছিলেন। তাই গোলাব খাঁ যখন গাহিতেন তখন নিয়ামৎ খাঁকে বীণাদ্বারা তাঁর সঙ্গীতের অনুসরণ করতে হ'ত। গোলাব খাঁর আসনের পশ্চাতে নিয়ামৎ খাঁর আসন পড়ত। গায়ক অপেক্ষা তন্ত্রকারের সম্মান তখনও কিছু অল্প ছিল। নিয়ামৎ খাঁ এতে মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে দুই বৎসরকাল বাদশার দরবারে আসা বন্ধ করে দিলেন। এই দুই বৎসর তিনি দুইটি ভিক্ষুক বালককে খেয়াল সঙ্গীত শিক্ষা

দিয়েছিলেন—ইহাই কাওয়ালী সঙ্গীতের নবজন্মের মূল ইতিহাস। বালকদ্বয়ের কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল এবং তুই বৎসর শিক্ষার পর তারা খেয়াল গানে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় মন অধিকার করে বসল। বাদশা সেই বালকদ্বয়ের সংবাদ মন্ত্রীমুখে শুনতে পেয়ে তাদের দরবারে আহ্বান করলেন এবং অভিনব প্রণালীর গান শুনে মুগ্ধ হ'লেন। নিয়ামৎ খাঁ এদের গুরু একথা জানতে পেরে বাদশা মহম্মদ শা নিয়ামৎ খাঁকে শ্রেষ্ঠ গুণীর আসন দিয়ে দরবারে পুনরায় আমন্ত্রণ করলেন। নিয়ামৎ খাঁর দরবারে পুনঃপ্রবেশের পর তিনি যে সম্মান পেলেন তা মিয়াঁ তানসেনের পর কোনও গুণী দিল্লী দরবারে পান নাই। নিয়ামৎ খাঁর আসন বাদশার সিংহাসনের পার্শ্বে করা হ'ল এবং বাদশা তাঁকে সখারূপে গ্রহণ করলেন। নিয়ামৎ খাঁকে আর ধ্রুপদী গোলাব খাঁর সঙ্গে বীণার অনুসরণ করতে হ'ত না, তাঁর বীণা বাদশাহ পৃথকভাবে শুনতে শুরু করলেন। বীণার সম্মান কণ্ঠসঙ্গীতকে ছাড়িয়ে উঠল।

এই সময় বাদশাহ নিয়ামৎ খাঁকে "শাহ" উপাধি প্রদান করলেন। দিগ্বিজয়ী বাদশাকে শাহ বলা হ'ত—আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাই। সেরশাহ, বাদশা আকবর প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাটগণ শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। নিয়ামৎ খাঁকেও বাদশা শ্রেষ্ঠ গুণী বিবেচনা ক'রে শাহ উপাধি প্রদান করেছিলেন। তানসেনের দৌহিত্র বংশের আরো তুইজন বীণকার দিল্লী দরবার থেকে "শাহ" উপাধি পেয়েছিলেন; তাঁরা নিয়ামৎ খাঁর বংশধর জীবন শাহ ও নির্মল শাহ। সঙ্গীতবিদ্যায় শিল্পপ্রকাশ

মহিমায় তাঁরা সমসাময়িক গুণীমণ্ডলীর মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেই শাহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

বাদশা মহম্মদ শা নিয়ামৎ খাঁর নূতন নাম দিলেন "শাহ সদারঙ্গ"। সদারঙ্গ নামটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। নিয়ামৎ খাঁ বীণায় ও কণ্ঠসঙ্গীতে "খোসরঙ্গ" বা হৃদয়গ্রাহী বিচিত্র সুষমা এত প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেন যা পূর্ববর্তী কোনও সঙ্গীতসাধক আনতে পারেন নাই। সদা তাঁর সঙ্গীতে রঙের ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হ'ত ব'লে তাঁর নাম "সদারঙ্গ" রাখা হয়েছিল। তানসেন-দুহিতা সরস্বতী দেবীর সঙ্গীতে নারীপ্রতিভাসুলভ বর্ণ বৈচিত্র্যসম্ভারের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সুতরাং নিয়ামৎ খাঁ রঙের এই বিচিত্র প্রকাশকৌশল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। আলো-ছায়ার বিচিত্র সংমিশ্রণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচিত্র বর্ণের সুচারু সামঞ্জস্যে যেমন চিত্রের শোভা বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ নিয়ামৎ খাঁর সঙ্গীতে সূক্ষ্ম সুরনিচয়ের শ্রুতির ও মীড় গমকের মনোহর সম্মিলনের ফলে বৈচিত্র্যে, ঐশ্বর্যে ও সৌকুমার্যে শ্রবণ মন পুলকে অভিভূত না হয়ে পারে না।

শাহ সদারঙ্গকে বাদশা মহম্মদ শা অর্থ ও পারিতোষিক এত দিতেন যা' আজ শুনলে রূপকথার মত মনে হবে। শোনা যায় বহু সোনা রূপা ও জহরৎ বকশিশ স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হ'ত। কিন্তু সদারঙ্গজী নিজে ফকিরের মত থাকতেন ও সমুদয় ধনরত্ন পথে পথে গরীব ভিখারীদের দান করে নিজে রিক্ত হয়ে পড়তেন। তাই প্রচুর অর্থ পেয়েও তাঁর অর্থের অভাব সর্বদাই থাকত। কোনও দরিদ্রকে তিনি দান না ক'রে পারতেন না।

অর্থ ফুরিয়ে গেলে মহাজনদের কাছ থেকে তিনি টাকা কর্জ করতেন ও পরে বাদশাকে সে সব কর্জ শোধ দিতে হ'ত। নিজে সাধু ফকিরের মত বিলাসলেশহীন জীবন যাপন করলেও অতিরিক্ত দানশীলতার জন্য তাঁকে বিপদে পড়তে হ'ত। তাঁর টাকা কর্জ করার একটা কৌতুককর প্রথা ছিল। মহাজনেরা টাকা দিতে হ'লেই কিছু সম্পত্তি বন্ধক চায়। সদারঙ্গজীর তো জমিদারী ছিল না—তাঁর কাছে মহাজনেরা রাগরাগিণী বন্ধক চাইত। অর্থাৎ টাকা পরিশোধ না করতে পারা পর্যন্ত সদারঙ্গজী অমুক অমুক রাগিণী বাদশাহী দরবারে গাইতে বা বাজাতে পারবেন না এরূপ কড়ার থাকত। বাদশাহ তারপর যখন সদারঙ্গকে সেই সেই রাগিণী বাজাতে বা গাইতে ফরমায়েস করতেন তখন সদারঙ্গজী বলতেন, "হুজুর! এই সব রাগিণী অমুক অমুক মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে, আমি এত টাকা সংগ্রহ করেছি।" বাদশা সহাস্যমুখে তখন টাকা পরিশোধ ক'রে দিতেন—সে এক বেশ কৌতুকপ্রদ ব্যাপার ছিল।

সদারঙ্গজী সত্যই দীনবন্ধু ছিলেন। পূর্বকথিত ভিক্ষুক বালকদ্বয়ের ভরণপোষণ ভার নিজেই বহন ক'রে তাদের দরবারে যথোচিত আসন দিয়েছিলেন। সেই ভিক্ষুক বালকদ্বয় "কাওয়াল" ব'লে হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের শ্রেষ্ঠ খেয়াল গান তাদের বংশেই শোনা গেছে। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী আহম্মদ খাঁ (যিনি কলিকাতায়ও অনেকদিন ছিলেন) তাঁদেরই বংশধর। কাওয়ালী রীতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা এই বংশেই পাই। প্রসিদ্ধ খেয়ালী তানরাজ খাঁ, হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ ও

নথু খাঁ প্রভৃতি সবাই এই ভিক্ষুকবংশধরদেরই শিষ্য। অদ্যাপি এঁদের ঘরানার দু'একটি ওস্তাদ রেওয়া দরবারে বিদ্যমান আছেন।

তবে, শা সদারঙ্গ নিজে খেয়ালী ছিলেন—তিনি খেয়ালের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সদারঙ্গ নিজে সর্বদাই ধ্রুপদ ও হোরি ধ্রুপদ গাইতেন ও বীণায় ধ্রুপদাদি আলাপ বাজাতেন। হিন্দুস্থানের সর্বসাধারণ তাঁর রচিত খেয়াল শুনে চমকিত হয় কিন্তু তাঁর রচিত ধ্রুপদ ও হোরি, যা তিনি নিজ বংশধরদের জন্য ও সঙ্গীতের উত্তম অধিকারীদের জন্য অসংখ্য রচনা করে গেছেন সর্বসাধারণ তার পরিচয় খুব অল্পই জানে। যারা তা শুনেছে তারা জানে মাধুর্যে ও গভীরতায় উভয়ের কত প্রভেদ। কাঞ্চনের সঙ্গে কাচের তুলনা হয় না। সদারঙ্গজী আপন পুত্রদিগকে উত্তম ধ্রুপদ, হোরি ও বীণার তালিম দিয়েছিলেন, তা অদ্যাপি তাঁর বংশে প্রচলিত আছে। তাঁর পুত্র অদারঙ্গ ও অন্যান্য বংশধরেরাও শিষ্যদিগকে খেয়াল শিখাতেন কিন্তু কেহই কখনও খেয়াল গান নাই। ধ্রুপদ, হোরি ও আলাপকেই তাঁরা রস প্রকাশের উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট অবলম্বন বলে মনে করতেন।

শাহ সদারঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র ফেরোজ খাঁ ও ভূপৎ খাঁ মহম্মদ শার সভা অলঙ্কৃত করে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। ফেরোজ খাঁর উপাধি "অদারঙ্গ" ছিল ও ভূপৎ খাঁ "মহারঙ্গ" উপাধি পেয়েছিলেন। মহারঙ্গের দুই পুত্র ছিলেন—জীবন শা ও প্যার খাঁ অংলীকট্। প্যার খাঁকে অংলীকট্ বলা হত —তার কারণ, অতি বাল্যাবস্থায় একবার প্যার খাঁ রাস্তায় খেলা করছিলেন, এই সময় একটা গরুর গাড়ী গাড়োয়ানের অসতর্কতা নিবন্ধন তাঁর দক্ষিণ হাতের তর্জনীর উপর দিয়ে

চলে যায় ও ফলে তাঁর সেই অঙ্গুলিটী কেটে যায়। এই জন্য তাঁর নাম ছিল অঙ্গুলিকট্ বা অংলীকট্। অঙ্গুলীকট্ প্যার খাঁ অনেক বয়স পর্যন্ত বীণা বাজান নাই। পরে তাঁর ভাই যখন বীণায় বিশেষ কৃতী হ'য়ে উঠলেন, তখন তাঁর পিতাকে একদিন দুঃখ ক'রে বললেন, যে বয়সও অনেক হ'ল, আঙ্গুলও নেই, তাঁর জীবনে আর বীণা শিক্ষা হবে না—জীবন তাঁর বৃথাই যাবে। মহারঙ্গ তখন পুত্রের কাতরতা দেখে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে এমন বীণা শিক্ষা দেবেন যে তাঁর তুল্য বীণকার হিন্দুস্থানে থাকবে না। বস্তুতঃ তাই হ'ল। তাঁর তর্জনীতে একটি বড় মেজ্‌রাব পরিয়ে দিয়ে মহারঙ্গ তাঁকে বীণা শিক্ষা দিলেন। কাটা অঙ্গুলি সত্ত্বেও প্যার খাঁ এমন বীণকার হয়ে উঠলেন যে তাঁর তুল্য বীণকার তখন ভারতে আর কেউ থাকল না। মহারঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় জীবন খাঁ ও অঙ্গুলীকট্ প্যার খাঁ দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ বীণকাররূপে সম্মানিত হন। তবে প্যার খাঁ খুব দীর্ঘায়ু হন নি, তাঁর কোনও সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জীবন খাঁ বাদশাহী দরবার থেকে শাহ্ উপাধি প্রাপ্ত হন। জীবন শাহ দিল্লী-দরবারের শেষ বীণকার।

মহম্মদ শা বাদশার মৃত্যুর পর দিল্লীর মোগলবাদশাহী ক্রমে দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে নামে মাত্র পর্যবসিত হয়। বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর শাহ্ আলম যখন দিল্লীর তক্তে বসলেন, তখন তাঁর নাম বাদশা থাকলেও তাঁর কোনও রাজ্য আর বিশেষ কিছু ছিল না। এই সময় দিল্লী-দরবার বা গুণীসভা

ভেঙ্গে যায়। দিল্লী-দরবারের গুণীসভার শেষ রত্নগণ তখন থেকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়লেন ও অন্যান্য রাজন্যবৃন্দের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শাহ আলমের পূর্বে দিল্লীর শেষ দরবারে তানসেনের পুত্রবংশীয় ছর্জু খাঁ রবাবী ও তাঁর দুই ভ্রাতা জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ঐ সময় বীণকারের আসনে জীবন শাহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ছর্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ এই ভ্রাতৃত্রয়ও অসাধারণ প্রতিভার আধার ছিলেন। ছর্জু খাঁ রবাব যন্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষসাধন ক'রে গিয়েছেন। জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ ধ্রুপদী ছিলেন। এই তিন ভ্রাতার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ অবদান ভারতীর চরণে দিল্লীদরবারের শেষ পুষ্পাঞ্জলি।

মোগল রাজত্বের পর দিল্লীর গুণীমণ্ডলী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারতের দুই অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। তানসেনের নিজ বংশধরগণ পূর্বদিকে চলে এলেন (তাঁদের নাম পুরবীয়া) ও তাঁর শিষ্যবংশীয় গুণীগণ রাজপুতনার রাজাদিগের সভায় স্থান পেলেন, তাঁদের নাম হ'ল পঁছাওয়ালা। তানসেনের পুত্রবংশীয় রবাবীগণ ও দৌহিত্রবংশীয় বীণকারগণ পূর্বভারতে এসে বারানসী-ধামে ভদ্রাসন স্থাপন ক'রে নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমান রাজা ও নবাবদের সম্মানিত পূজা-উপচার লাভ করলেন। ঐ সময় অযোধ্যার নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার রাজা, বারানসীর নরেশ ও অন্যান্য অনেক নৃপতি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী, এমন কি অনেকে সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্তও ছিলেন। দিল্লী থেকে রবাবী ও বীণকারগণ চলে আসার পর এই নৃপতিগণ তাঁদের

এত আগ্রহের সহিত বরণ ক'রে নিয়েছিলেন যে তাঁদের কোনও দুঃখকষ্টের মুখ কখনও দেখতে হয় নাই। তানসেনের বংশধরগণ যখন দিল্লী ছেড়ে পূর্বভারতে চলে আসছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে একজন বড় ধ্রুপদীকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মহারাজা। বাংলাদেশে ধ্রুপদ গানের বহুল প্রচার ও আদরের মূল ইতিহাস এখানে আমরা পাই। বিষ্ণুপুরের মহারাজা রবাবী ছর্জু খাঁর অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ও ধ্রুপদী জীবন খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁকে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন ও তাকে যথোচিত সম্মান ও সমাদরের সহিত রেখেছিলেন। বাহাদুর খাঁ কয়েকজন উত্তম বাঙ্গালী ধ্রুপদী শিষ্য তৈরী ক'রে গিয়েছেন। তিনি কখনও বিদ্যা গোপন করেন নি।

পরলোকগত বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী যদু ভট্ট বাহাদুর খাঁরই শিষ্যবংশীয় ছিলেন। যদু ভট্টের ন্যায় গায়ক ভারতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁর প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও বাংলার এ যুগের ধ্রুপদী সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বাহাদুর খাঁর শিষ্যঘরানাদার। অনেকে বলেন যে, "সেনী"গণ কাহাকেও শিখান না। এ কথা যে কত ভুল তা বুঝতে পারি তখনই, যখনই দেখি সুদূর দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর জনৈক গুণী বাংলায় এসে উৎকৃষ্ট শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদ কত বহুল পরিমাণে ও অকপটে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত গুণীর উদ্ভব বাংলায় সম্ভব হয়েছে।

বীণানায়ক জীবন শাহের দুই পুত্র ছোট নবাৎ খাঁ ও নির্মল শাহ বীণাকরণ নৈপুণ্যে ভারতে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন। ছোট নবাৎ খাঁকে সকলেই বলতেন যে স্বয়ং মিশ্রীসিং পুনরায় জন্ম নিয়ে এসেছেন। তাঁর অপর নাম ছিল রসবীণ খাঁ। পণ্ডিতপ্রবর সুদর্শনাচার্যশাস্ত্রীজী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"নবাৎ খাঁজীকে বংশমে অন্তমে রসবীণ খাঁজী ভারি বীণকার হোয়ে, লোগ ইনকো দুস্‌রে নবাৎ খাঁজী কহতেথে যে প্রথম এয়্‌সে হি ফিরা করতেথে, এক দিন এক সমাজমে নিরাদর পা কর্ পিতাসে খানেকে সংখিয়া মাঙ্গা, পিতানে বহুৎ সমঝয়া কহা কি সংখিয়া খানেকী কোই জরুরত নহি, পরিশ্রম করো, চবিশ দিনমে তুম্‌সে বীণা বজবা দেঙ্গা। ঐসা হি কিয়া, ফির্ তো য়ে বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ্ হোগয়ে।"

অর্থাৎ নবাৎ খাঁজীর (মিশ্রীসিংজীর) বংশে শেষদিকে রসবীণ খাঁজী খুব বড় বীণকার হয়েছিলেন, লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় নবাৎ খাঁ বলত। ইনি প্রথম জীবনে অমনি ঘুরে বেড়াতেন। একদা লোক সমাজে অনাদর পেয়ে পিতার নিকট সেঁকোবিষ চেয়েছিলেন। পিতা (জীবন শা) তাঁকে তখন খুব বোঝালেন যে সেঁকোবিষ খেতে হবে না, পরিশ্রম করলে চব্বিশদিনের মধ্যে তাঁর হাতে তিনি বীণা বাজিয়ে দিবেন! বস্তুতঃ তাই তিনি করেছিলেন ও পরে রসবীণ খাঁ বীণায় অদ্বিতীয় গুণী হয়েছিলেন।

ছোট নবাৎ খাঁর হাতে এত মিষ্ট সুর ছিল যে গুণীগণ তাঁকে

আদর করে 'রঙ্গারঙ্গ' বলে ডাকতেন। ছোট নবাৎ খাঁর পুত্র ওমরাও খাঁ-ও পৈতৃক গুণ এবং বিদ্যা সম্পূর্ণরূপেই পেয়েছিলেন। নির্মল শাহ ছিলেন ছোট নবাৎ খাঁ বা রসবীণ খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এঁরা দুই ভাই, উভয়েই এত বড় গুণী ছিলেন যে এঁদের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করা সুকঠিন। নির্মল শাহকে অযোধ্যার নবাব "শাহ" উপাধি দিয়েছিলেন।

আধুনিক ভারতের প্রায় সকল বড় তারের যন্ত্রবাদকই নির্মল শাহের কোনও না কোনও শিষ্যের ঘরানা। নির্মল শাহের একটা বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি সঙ্গীতবিদ্যার খুব বিস্তার ক'রে গেছেন, তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। কাওয়ালদের মধ্যে প্রসিদ্ধ খেয়ালী ছক্কর মখ্‌খন খাঁ তাঁর শিষ্য। নির্মল শাহ শিষ্যদের অধিকার রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় অঙ্গেরই শিক্ষা দিতেন। তাঁর ধ্রুপদ অঙ্গের শিক্ষা পেয়েছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বীণকার মুসরফ খাঁর পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁর খেয়ালী শিষ্যদের বংশে সুপ্রসিদ্ধ বীণকার বন্দে আলি খাঁ ও মোরাদ খাঁ এবং বিখ্যাত সেতারী ইম্‌দাদ খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। নির্মল শাহ নিজে খুব শক্তিশালী বাদক ছিলেন। তাঁর বীণায় কমনীয়তা অপেক্ষা শক্তিরই সমধিক পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর ভ্রাতার বাদ্যে ললিতমধুর রসই প্রকাশ পেত কিন্তু তাঁর বীণায় ছিল উদাত্ত ভাবের রস। বীণার ধ্বনি সাধারণতঃ একটু ক্ষীণ, অধিক দূর পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু নির্মল শাহ এত মোটা তারে বাজাতেন যে বড় বড় সভামণ্ডপের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁর বীণার নিক্বণ তীব্রমধুর অনুরণনে শ্রোতৃ-

বৃন্দের শ্রবণকুহরে ঝঙ্কৃত হ'ত অতি স্পষ্টভাবে। তিনি ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতে সত্যই এক নূতন প্রাণ সঞ্চার ক'রে ছিলেন।

নির্মল শাহ ধ্রুপদ অঙ্গের চারি বাণীতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ধ্রুপদ ও বীণার চারি বাণী হচ্ছে—'গৌড়ীয় (বা গোবরহারী) বাণী,' 'খাণ্ডার বাণী,' 'ডাগর বাণী' ও 'নওহার বাণী'।* গৌড়ীয় বাণীর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে প্রসাদগুণ। ইহা শান্তরস উদ্দীপক—ইহার গতি ধীর। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য প্রকাশই খাণ্ডার বাণীর বিশেষত্ব। ইহা তীব্ররস উদ্দীপক—ইহার গতি খুব বিলম্বিত নয়। গৌড়ীয় বাণীর অপেক্ষা এর বেগ ও তরঙ্গ অধিক। বলা বাহুল্য, প্রচলিত খাণ্ডার বাণী বা সুরের মল্লযুদ্ধ এবং প্রকৃত খাণ্ডারী রীতিতে অনেক তফাত। ডাগর বাণীর

---

* হাকিম মহম্মদ "মাদনূল মুসিকী" নামক গ্রন্থে চারিটী বাণীর উদ্ভাবকদিগের সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"আকবর বাদসাহের দরবারে তখন চারিজন মহাগুণী বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—

(১) তানসেন—গোয়ালিয়রবাসী, পিতার নাম মকরন্দ, বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য, পূর্বে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(২) ব্রিজচন্দ—ব্রাহ্মণ, বাড়ি ছিল দিল্লীর নিকটে ডাণ্ডব গ্রামে।

(৩) রাজা সমোখন সিংহ—রাজপুত, বীণকার, খণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী।

(৪) শ্রীচন্দ—রজপুত, বাড়ি ছিল নৌহার।

আকবরের সময়ে এই চারিজনে চারিটী বাণী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁর বাণীর নাম ছিল গৌড়ীয় অথবা গোবরহরী। প্রসিদ্ধ বীণকার সমোখন সিংহ তানসেন-কন্যার পাণি গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম হইয়াছিল নৌবাদ খাঁ। নৌবাদ খাঁর বাণীর নাম "খাণ্ডারী", কারণ তাঁহার বাসস্থানের নাম ছিল খাণ্ডার। ব্রিজচন্দের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁহার বাণীর নাম হইয়া.ছ ডাগর। রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী ছিলেম বলিয়া তাঁহার বাণীকে নওহার বাণী বলা হয়।"

প্রধান গুণ হচ্ছে সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। এর মধ্যে সুরের যে বলয়িত বঙ্কিম বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায় বস্তুতঃ তা মোটেই কঠিন নয়। নওহার রীতি বলতে সিংহের গতি বোঝা যায়। এক সুর হ'তে দু-তিনটি সুর লঙ্ঘন করে পরবর্তী সুরে যাওয়া এর লক্ষণ। নওহার খুব বড় কিছু রসের সৃষ্টি করে না—ইহা আশ্চর্যরসোদ্দীপক। আমরা যাকে শুধু বাণী বা শুদ্ধবাণী বলি তা গৌড়ীয় ও ডাগরী বাণীরই নামান্তর। শুদ্ধবাণীই সঙ্গীতের আত্মা। সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠাই যে শুদ্ধবাণীতে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। খাণ্ডার বাণীতে সুরের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে যদি তা শুদ্ধবাণীর যতি ও ছন্দ ভঙ্গ না করে। খাণ্ডার বাণী শুদ্ধবাণীর সংশ্রব থেকে বিচ্যুত হ'য়ে চল্লে অতি উৎকট হ'য়ে ওঠে। তার জাঁকজমকে তখন লোক হতভম্ব হ'তে পারে কিন্তু চিত্তের পিপাসা তাতে মেটে না। সে সঙ্গীত প্রাণে কোনও শান্তি বা কোনও আনন্দের পরশ দেয় না। সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ যে রসবস্তু তার অবিকৃত উৎস পাওয়া যায় শুদ্ধ বাণীতে। রসের প্রকাশ-বৈচিত্র্য সম্ভব তার পক্ষেই, যে সে উৎসের সন্ধান পেয়েছে। তাই সেনীগণ সর্বদাই শুদ্ধবাণীর সঙ্গীতের উপর এত জোর দিয়ে গেছেন। নির্মল শাহের বীণায় খাণ্ডারের তানের ঐশ্বর্য যথেষ্ট থাকলেও, তার বীণাসঙ্গীতের মূল প্রেরণা আসত ধ্যানগম্ভীর ও সাগরগভীর শুদ্ধবাণী থেকে।

সঙ্গীতের চারি বাণীর মধ্যে গৌড়ীয় বাণীকে গুণীগণ রাজার আসন দিয়েছেন। ডাগর বাণীকে মন্ত্রীর স্থান, খাণ্ডারকে

সেনাপতির স্থান ও নওহারকে ভৃত্যের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি বাণীরই আপন আপন স্থানে বিশিষ্ট এক সার্থকতা আছে। তবু প্রথমোল্লিখিত বাণীদ্বয় শুদ্ধবাণীর অন্তর্ভূক্ত। গৌড়ীয় বাণীর স্বরগুলির প্রত্যেকটি আপন আপন সীমায় সুনির্দিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। স্পষ্টতাই হচ্ছে এই বাণীর প্রধান লক্ষণ। ডাগর বাণীতে একটি স্বর অপরটির সহিত যেন মিশে যেতে চায়, তাই ডাগর বাণীতে একটা কেমন রহস্যময় ভাব থাকে। সুরগুলিকে স্পষ্টভাবে ধরাছোঁওয়া যায় না, শ্রোতার কল্পনা দিয়ে যেন তা'কে পূর্ণ ক'রে নিতে হয়। লালিত্য ও গভীরতা এ উভয় বাণীর মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। খাণ্ডার বাণীকে সংস্কৃতে "ভিন্না রীতি" বলা হইয়াছে। এই বাণীতে সুরগুলিকে কেটে কেটে গাওয়া হয়—তাই সংস্কৃতে একে "ভিন্না" (ভিদ্ ধাতু হ'তে ভিন্ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে) বলা হয়, ও হিন্দুস্থানীতে "খাণ্ডার" বলা হয়। উভয় শব্দের মূল তাৎপর্য একই। সুরগুলিকে সরলভাবে প্রকাশ না ক'রে এতে কুটিলভাবেও কেটে কেটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এতে মাধুর্য হ্রাস পায় না। সূক্ষ্ম গমকের সাহায্যে সুর কাট্‌লে বা আন্দোলিত করলে তাতে মধুরতা বৃদ্ধিই পেয়ে থাকে। তাই উত্তম গুণীগণ সূক্ষ্ম মধুর গমক সহযোগেই খাণ্ডার বাণী গেয়ে থাকেন। গমকের অপপ্রয়োগ ও উৎকট প্রয়োগেই খাণ্ডার বাণীর বিকৃতি এসেছে। কিন্তু পূর্বাচার্যগণ ও তানসেন বংশীয় বীণকারগণ অতি সূক্ষ্ম গমক এবং শ্রুতি প্রয়োগে খাণ্ডার বাণীতেও যথেষ্ট মধুরতা প্রকাশ ক'রে গেছেন।

তবে শুদ্ধবাণীকেই সর্বদা রক্ষা করে চলা উচিত। খাণ্ডার বাণী বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেনীগণ তাই ক'রে এসেছেন। সেনীধ্রুপদের অধিকাংশই শুদ্ধবাণীতে গীত হয়। আলাপের সময় বিলম্বিত অংশে শুদ্ধবাণীরই প্রাধান্য। মধ্যতালে খাণ্ডার বাণী বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রসঙ্গীতে বীণাতেই খাণ্ডার বাণীর মধ্যতাল বা গমক জোড় সেনীগণ রকমারিভাবে ব্যবহার করেছেন কিন্তু রবাবে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই ত্রিবিধ আলাপ অংশেই শুদ্ধবাণীরই সমান প্রাধান্য আছে। কেননা রবাবের স্বর সরল—রবাবে বীণার ন্যায় গমক তেমন খোলে না।

(তানসেনের পুত্রবংশীয় সকল গুণীই গৌড়ীয় বাণীতে সিদ্ধ ছিলেন।) তাই তাঁদের গীত ও বাদ্যে রঙ্গের খেলা তত পাওয়া যায় না, কিন্তু রাগের নগ্ন সৌন্দর্য প্রকাশে তাঁদের তুলনা হয় না। (সরলতাই তাঁদের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের প্রকৃতিও তাঁদের সঙ্গীতের মতই সরল ছিল। তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ থেকে শুরু করে হাসান খাঁ, গোলাব খাঁ, ছর্জ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ, জীবন খাঁ প্রভৃতি গুণীগণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাঁরা মুনিদের মত সরল অনাড়ম্বর ও ভগবৎপ্রাণ ছিলেন। হাসান খাঁকে সবাই "শুভ্রদেবতা" বা সফেদ্ দেও বলত, তাঁর অন্তঃকরণও যেমন সাদা ছিল তাঁর শরীরেরও তেমনি এক মনোহর গৌরকান্তি ছিল। এঁরা কেহই বাদশাদের দরবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকতেন না। ঐহিক ধনরত্নের ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের বাহিরে নির্জন কুটিরেই

এঁরা বসবাস করতেন—বাদশাহগণ অযাচিতভাবে অজস্র অর্থ দিয়ে গেলেও, অধিকাংশ অর্থই এঁদের দানে ও দীনজন-প্রতিপালনে ব্যয়িত হ'ত। বাদশারা যখন তখন ইচ্ছা করলেই এঁদের গীত ও বাদ্য শুনতে পেতেন না। অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে এঁদের দরবারে আনতে হ'ত।

হাসান খাঁ ও তাঁর পুত্র—গোলাব খাঁ উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী ছিলেন। গোলাব খাঁর তিন পুত্র ছর্জ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ। ছর্জ্জু খাঁ রবাবযন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ ধ্রুপদী ছিলেন। এই তিন ভ্রাতার শেষ জীবনেই দিল্লীর বাদশাহি দরবার ভেঙে যায়। ছর্জ্জু খাঁর তিন পুত্র—জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ। জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। জীবন খাঁর দুই পুত্র—বাহাদুর খাঁ ও হায়দর খাঁ। বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের মহারাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হ'য়ে বঙ্গদেশে চলে এলেন ও হায়দর খাঁ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন ক'রে ফকীর হ'য়ে গেলেন। বাহাদুর খাঁর বাঙ্গালী শিষ্য-বংশের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। হায়দার খাঁ ফকীর ছিলেন ও সঙ্গীতসাধনায়ও বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এক ধ্রুপদী শিষ্যের বংশ কানপুরের নিকটে এখনও আছে। লক্ষ্ণৌর গুণী রাজা নবাব আলি খাঁ সাহেব তাঁদের বিশেষ সম্মান ও প্রশংসা ক'রে থাকেন।

ছর্জ্জু খাঁর তিন পুত্র—জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁর নাম ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই ভ্রাতৃত্রয় সত্য সঙ্গীতের অবতার স্বরূপ ছিলেন। গীতে, বাদ্যে, বিদ্যায় ও সাধনায় এঁদের স্থান তৎকালে সকলের শীর্ষে

ছিল। এঁরা সত্যই নায়কপদবাচ্য ছিলেন। জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ, পিতা ছর্জ্জু খাঁর কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন কিন্তু বাসৎ খাঁর গুরু ছিলেন তাঁর খুল্লতাত জ্ঞান খাঁ। জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন বলে ভ্রাতুষ্পুত্র বাসৎ খাঁকেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁকে বুকে ক'রে মানুষ করেছিলেন। বাসৎ খাঁকে তিনি যোগসাধনা ও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তদ্ভিন্ন নির্মল শাহ বীণকারও এই ভ্রাতৃত্রয়কে খুব ভালবাসতেন, এঁদের প্রতিভা অতি বাল্য হতেই স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছিল ও নির্মল শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নির্মল শাহ ছিলেন তানসেনের দৌহিত্র-বংশীয়, তাই এঁদের তিনি জ্ঞাতি সম্বন্ধে গুরু ছিলেন ও এঁদের সস্নেহে বীণা শুনাতেন ও বীণার গূঢ় রহস্য সকল লিখে দিয়েছিলেন। নির্মল শাহের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁর সমুদয় বিদ্যা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওম্‌রাওকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। ওম্‌রাও ছিলেন প্যার খাঁর সমবয়সী ও অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ। কিন্তু সঙ্গীত বিষয়ে তাঁদের প্রতিযোগিতাও খুব তীব্র ছিল। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ এই তিন ভ্রাতা ও ওম্‌রাও খাঁ—এঁরা সকলেই একই সময়ে একই স্থানে বাল্যজীবন অতিবাহিত করেছিলেন—ছর্জ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও নির্মল শাহের ন্যায় সঙ্গীতসিদ্ধ হয়েছিলেন গুরুদের স্নেহ-ছায়ায়। তাই এঁদের মাঝে সঙ্গীত সাধনার বীজ সুসময়ে সুক্ষেত্রে পতিত হ'য়ে, কালে ফুলে ফলে সুশোভিত বিশাল সঙ্গীত-তরুরূপে হিন্দুস্থানের অসংখ্য সঙ্গীতপিপাসুদিগকে কল্পবৃক্ষের ন্যায় আশ্রয় দিতে পেরেছে।

জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ বাল্যকালে নির্মল শাহের সহিত একত্রে অনেকদিন বসবাস করেছিলেন ও বীণা শিক্ষালাভ করেছিলেন। দিল্লীর বাদশাহীর অবসানের পর তানসেন-বংশীয় গুণীগণ বারাণসীতে ভদ্রাসন স্থাপন ক'রে সমীপবর্তী রাজন্য-বৃন্দের সভায় যাতায়াত করতেন। কোনও গুণী অযোধ্যার দরবারে, কেহ রেওয়াধিপতির সভায়, কেহবা বেতিয়ার নরেশের রাজসভায় আহূত হ'য়ে যেতেন। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁরা বাঁধাবাঁধিভাবে কোনও দরবারে বা সভায় থাকেন নি। বৎসরের মধ্যে ইচ্ছামত নানা সময়ে নানা সভায় যেতেন—যেখানে যেতেন সেখানকারই নরেশ বা নবাব নিজেকে ধন্য মনে ক'রে তাঁদের যথোচিত সংবর্ধনা করতেন। তবে বৎসরে একবার ক'রে তানসেনবংশীয় সকল গুণীই বারাণসীতে সম্মিলিত হ'তেন, একটা পারিবারিক প্রীতি-সম্মিলন বৎসরে একবার ক'রে অনুষ্ঠিত হ'ত। তখন প্রত্যেক গুণী নিজ নিজ গুণ ও বিদ্যার পরিচয় দিতেন। বাসৎ খাঁ প্যার খাঁ ও জাফর খাঁকে নির্মল শাহ্ একবার মাসাধিক কাল ধ'রে প্রত্যহ বীণা শোনাতেন ও বীণা বাদনের কৌশল বোঝাতেন, তিনি প্রত্যহ নূতন নূতন প্রণালীতে নায়কী তার থেকে মন্দ্রের তারে গিয়ে মন্দ্র ষড়্‌জ স্বর এভাবে খুলতেন যে সেই ভ্রাতৃত্রয় বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন। নির্মল শাহ্ কি ক'রে মূদারা গ্রাম থেকে বিদ্যুৎঝলকের মত উদারা গ্রামের স্বর সকল প্রকাশিত করতেন—বীণার সারি বা পর্দায় কত রকমের অঙ্গুলির খেলা সম্ভব তা' দেখে ভ্রাতৃত্রয় বিস্মিত হ'তেন। কিন্তু মাসাধিক কাল শুনেও সেই কৌশল হৃদয়ঙ্গম

করতে পারেন নি। অবশেষে নির্মল শাহ্ তাঁদের তা' বুঝিয়ে দেন।

কিন্তু নির্মল শাহ্ যখন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, সেই সময় তাঁর পুত্রতুল্য ও ছাত্রোপম জাফর খাঁ নিজ প্রতিভা-বলে তাঁর সমকক্ষ স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। একবার বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনে যখন সকল গুণী কাশীধামে সমাগত, তখন কাশী-রাজার সভায় নির্মল শাহের বীণা ও জাফর খাঁর রবাব বাজনা অনুষ্ঠিত হয়। তখন বর্ষাকাল। রবাবের চামড়া বর্ষাকালে শিথিল হয়ে যায় ব'লে বর্ষায় রবাবের আওয়াজ চেপে যায় ও এক প্রকার শ্রুতিকর্কশ 'ঢপ্ ঢপ্' শব্দ বাহির হয়। তাই নির্মল শাহের অপূর্ব বীণা ঝঙ্কারের পর রবাবের আওয়াজ অতি বিশ্রী লাগল। জাফর খাঁ তখন বাজনা ক্ষান্ত ক'রে কাশী-রাজ ও নির্মল শাহকে বললেন যে, একমাস পর তিনি বাজনা শোনাবেন। এই একমাসে জাফর খাঁ বারাণসীর যন্ত্রেরকারিগর দ্বারা এক অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করালেন। এই যন্ত্র রবাবেরই ন্যায়—তবে এতে চামড়া নাই, নিম্নাংশে চামড়া ও কাঠের পরিবর্তে ইহাতে আছে সুরবাহারের মত লাউ ও উপরিভাগে স্বরোদের মত কাঠের দন্তের উপরে স্টীল প্লেট বসানো। রবাবে তাঁত বাজে আর ইহাতে স্টীল ও পিতলের তার ব্যবহৃত হয়। জাফর খাঁ এই যন্ত্রের নাম দিলেন 'সুরশৃঙ্গার'। বীণা ও রবাব এই উভয় যন্ত্রের বিভিন্ন 'বাজ্' বা বাদনপ্রণালী মিশ্রিত ক'রে তিনি সুরশৃঙ্গার যন্ত্র প্রবর্তিত করলেন। একমাস পর সুরশৃঙ্গার যন্ত্র নিয়ে তিনি কাশী-রাজের কাছে গেলেন ও এক প্রকাণ্ড

সভা আহ্বান ক'রে নির্মল শাহকে নিমন্ত্রিত করালেন। সুর-শৃঙ্গারের স্বর এত সুমিষ্ট যে ইহার তারগুলিতে শুধু ঝঙ্কার দিলেই প্রাণ শীতল হয়ে যায়। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে যখন বীণা ও রবাবের সমুদয় আলাপ-অঙ্গ দেখিয়ে জাফর খাঁ বাজালেন তখন নির্মল শাহ জাফর খাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন "বাঃ বেটা! তুমি আজ বীণাকে হারিয়ে দিয়েছ।" একেই বলে "সর্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ শিষ্যাৎ পুত্রাৎ পরাজয়ম্।" জাফর খাঁর নবগৌরবে নির্মল শাহের বুক উল্লাসেই ভরে উঠল।

অতঃপর রবাবী বংশীয় গুণীগণ বর্ষাকালে রবাবের পরিবর্তে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রই বাজাতেন। শীতকালে এবং মৃদঙ্গ সঙ্গতের সময় রবাব ব্যবহার করতেন, কেননা মৃদঙ্গ সঙ্গতে রবাব শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। অদ্যাপি এই রীতি চ'লে আসছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রাগ্‌ভাগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তানসেনবংশীয় কয়েকটি উজ্জ্বল প্রতিভাশালী যন্ত্রকারকে যুগপৎ দেখতে পাই। ভারতীয় সঙ্গীতের যন্ত্রবিভাগের ইহা একটি অতি গৌরবময় যুগ। কণ্ঠ-সঙ্গীতের শীর্ষস্থান যন্ত্র-সঙ্গীত অধিকার ক'রে বসার কারণ আছে। প্রথমতঃ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ-সঙ্গীতে যে প্রচুর প্রাণ-শক্তির সংহত ও বিশাল আত্মপ্রকাশ পূর্বে পাওয়া যেত, পরবর্তী যুগে তা কমে এসেছিল। প্রাণের বিশালতা ধীরতা ও একতা-নতার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সেই সাধনার উপযোগী আধার সংখ্যায় হ্রাস পেয়ে এসেছিল। প্রাণায়ামকে ব্যাপকতর অর্থে আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি, তবে সঙ্গীতকে এক শ্রেষ্ঠ

প্রাণায়াম বলে বুঝতে পারি। প্রাণায়ামের ফল প্রাণের উপর সম্পূর্ণ অধিকার—প্রাণের ব্যাপ্তি ও প্রাচুর্য। পরবর্তী গুণীদের দেহ-যন্ত্রে যখন প্রাণের ধারণ-সামর্থ্য কমে এল তখন তাঁরা বাহিরের বীণা-যন্ত্রেই প্রাণের বিকাশের সমুদয় সাধনা নিয়োগ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

যন্ত্র-সঙ্গীতের উৎকর্ষের দ্বিতীয় কারণ, যন্ত্র-সঙ্গীতে যে ধরনের বৈচিত্র্যের বিকাশ যতটা সম্ভব হয়, কণ্ঠ-সঙ্গীতে তা সম্ভব নয়। কণ্ঠের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হ'বার কারণ এই যে উহা সহজাত ও কণ্ঠের সুরকে যথেচ্ছভাবে খেলানো যতটা সহজ, একটা বাহিরের জড়যন্ত্র থেকে সুর বাহির ক'রে তাকে ইচ্ছামত খেলানো তত সহজ নয়। কিন্তু যন্ত্র জড় বলেই তার সুবিধাও আছে। যান্ত্রিক সুবিধা এই যে, মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক সীমা আছে, যন্ত্র জড়বস্তু—জড়ের সে সীমা নাই, জড়ের পরিশ্রম হয় না, জড় হ'তে এমন অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, জীবিত প্রাণীর কাছ থেকে যা পাওয়া সম্ভবপর হয় না। মোটর গাড়ির সুবিধা অশ্বযানে যেমন পাওয়া সম্ভব নয়। জড়ের সহিত চেতনের পার্থক্য চিরকালই রহিয়াছে—ভবিষ্যতেও থাকিবে।

যন্ত্র-সঙ্গীতে "দ্রুত" অংশের উৎকর্ষ অনেক বেশী। কণ্ঠ হতে "বেসুর" দূর করা কঠিন কিন্তু যন্ত্রকে সুন্দর ভাবে বাঁধলে সুমিষ্ট স্বর উহা হ'তে স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

বলা বাহুল্য, কণ্ঠ-সঙ্গীতে যেমন প্রাণায়াম বা শ্বাসের উপর অধিকার প্রয়োজন, যন্ত্র-সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্যও একটা প্রাণের

স্থৈর্য প্রয়োজন—চঞ্চল প্রাণ নিয়ে গভীর ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের বিকাশ কখনও সম্ভব নয়।

গত শতাব্দীর সেনীগুণীগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট যন্ত্রসঙ্গীতের বিকাশ খুবই হ'য়ে গেছে। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁ রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে এবং ওম্‌রাও খাঁ বীণাযন্ত্রে সঙ্গীতের এত গভীর ও উন্নত স্তর খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, যে কণ্ঠ-সঙ্গীতের উন্নতির অভাব সত্ত্বেও কোন প্রকার অভাব কেহ বুঝতে পারে না। প্যার খাঁ ও বাসত খাঁ শুধু যন্ত্র-সঙ্গীতে নয়—কণ্ঠ সঙ্গীতেও অসাধারণ প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি দেখিয়ে গেছেন। প্যার খাঁ অতি সুমধুর কণ্ঠ-গায়ক ছিলেন, আর বাসৎ খাঁ তো শেষ বয়সে শুধু গানই গাইতেন। বাসৎ খাঁ অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা ক'রে গেছেন।

জাফর খাঁ ছিলেন যন্ত্র-সঙ্গীতে সিদ্ধ। অতি কঠোর তপস্যায় তিনি "রবাবী" সঙ্গীত পদ্ধতিকে যন্ত্র-সঙ্গীতের শীর্ষস্থানে তুলতে পেরেছিলেন। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের অপরূপ লালিত্য ও আবেশময় মাদকতা তাঁরই দান। প্যার খাঁও সুর-শৃঙ্গার যন্ত্রই অধিকাংশ সময় বাজাতেন। জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ উভয় ভ্রাতাই অনেক সময় স্বনামধন্য, প্রতিভার অবতার স্বরূপ রাজারাম বংশীয় রেওয়াধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের সভায় থাকতেন। মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে বাংলা কোনও মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি সূর্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী মহাশয় অনেক আলোচনা করেছেন। মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ সঙ্গীত বিদ্যায়ও অতি পারদর্শী ও যথার্থ সঙ্গীত-সাধক ছিলেন।

তিনি জাফর খাঁ সাহেবের শিষ্য ছিলেন ও অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা ক'রে গেছেন। রাজারাম ও রাজা মানের পর সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধনায় হিন্দু নৃপতিগণের মধ্যে মহারাজ বিশ্বনাথের নাম অগ্রগণ্য চিরদিন থাকবে।

প্যার খাঁও মহারাজ বিশ্বনাথের সভায়ই থাকতেন, তবে মাঝে মাঝে বেতিয়ার মহারাজ নন্দকিশোরের দরবারেও যেতেন। নন্দকিশোর একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী ছিলেন ও অনেক ধ্রুপদ নিজে রচনা ক'রে কথক ব্রাহ্মণ গায়কদের শিক্ষা দিতেন। বেতিয়ার 'কথক' ঘরানা ওস্তাদরা তাঁর শিষ্যবংশ থেকেই এসেছেন। বেতিয়ার কথক ঘরানা ব্রাহ্মণ গায়কদের মধ্যে বখতাওরজী, শিবনারায়ণজী, গুরুপ্রসাদজী প্রভৃতি গুণিগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য। বোধ হয় একথা অনেকে জানেন কলিকাতায় বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ রাও এই শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য ছিলেন এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী অনেক দিন গুরুপ্রসাদজীর কাছে শিখেছিলেন। বিখ্যাত গায়ক কাশীনাথও বেতিয়ার ঘরানা ছিলেন। বেতিয়ার মহারাজ নন্দকিশোর প্যার খাঁর শিষ্য ছিলেন। এই থেকেই আমরা দেখতে পাই, ভারতের সমস্ত ঘরানা গুণীরাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তানসেন বংশের কাছে ঋণী।

প্যার খাঁ সাহেব শুধু একজন অদ্বিতীয় সুমিষ্ট গায়ক বা বাদকমাত্র ছিলেন না—তিনি সঙ্গীতেরও একজন উঁচুদরের স্রষ্টা ছিলেন। তিলক-কামোদ রাগিণীর নাম সঙ্গীত-রসিক মাত্রেই জানেন। তিলক-কামোদের গভীরতা কম নয় অথচ ইহা এত

শ্রুতিমধুর যে অশিক্ষিতদের প্রাণও এই রাগিণীতে সাড়া না দিয়ে পারে না। এই তিলক-কামোদ রাগিণীটি প্যার খাঁর সৃষ্টি। তিনি এক অতি নগণ্য সুর থেকে এই সুমিষ্ট রাগিণীটি তৈরী করেছিলেন। এক দিন প্যার খাঁ গ্রাম্যপথে বিচরণ করছিলেন —কোনও কুটিরে একটি গ্রাম্য-স্ত্রীলোক গ্রাম্যসুরে একটি ছড়া গাইতে গাইতে যাঁতাতে গম পিষছিল। সেই সুরটি প্যার খাঁ সাহেবের কানে ভারী ভাল লেগে গেল। তিনি দেখলেন, যে সেই সহজ মেঠো সুরে বড় বড় রাগিণীর এক অযত্নসুলভ মিশ্রণ রয়েছে—তাই অবলম্বন ক'রে তিনি তিলক-কামোদ রাগিণী তৈরী করলেন। দেশ, বেহাগ ও কামোদ মিশ্রিত ক'রে তিলক-কামোদের সৃষ্টি হ'ল। তিলক-কামোদ সঙ্গীত-জগতে অমর হয়ে রইল। এই রাগিণীতে প্যার খাঁ উৎকৃষ্ট আলাপের পথ খুলে দিলেন ও উৎকৃষ্ট সব ধ্রুপদ এই রাগিণীতে রচনা ক'রে জগতে নিজ সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দিলেন।

সঙ্গীতপ্রতিভা একেই বলে। রাগরাগিণী মেশাতে অনেকেই অল্পবিস্তর পারে—কিন্তু এইরূপ মিশ্রণের ফলে একটি স্বতন্ত্র প্রাণবন্ত রাগিণী সৃষ্টি করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। এই ক্ষমতা যাঁর আছে তিনিই যথার্থ কলাবিদ। প্যার খাঁর এই ক্ষমতা ছিল—আর তিনি ছিলেন অতি প্রাণস্পর্শী কলাবিদ। বিদ্যায় মানুষের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হ'তে পারে বটে কিন্তু মাধুর্যে মানুষের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। প্যার খাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে ও সুরশৃঙ্গারে এক অপরূপ উন্মাদনী ও দ্রাবিনীশক্তি ছিল, যা তাঁর সমসাময়িক খুব কম গুণীরই ছিল। প্যার খাঁ রবাবী যন্ত্রসঙ্গীতের গাম্ভীর্যের

সাথে বীণকারের মোহন ঝঙ্কার মিশিয়েছিলেন, ধ্রুপদের ধীর-উদাত্ত রসে হোরীর লালিত্য মিশিয়েছিলেন—এই মিশ্রণের ফলেই তাঁর সঙ্গীত সম্মোহনগুণে ও চিত্তাকর্ষণে অতুলনীয় স্থান অধিকার করেছিল।

প্যার খাঁর যুগপৎ উত্তরসাধক ও প্রতিযোগী ছিলেন বীণকার ওমরাও খাঁ। এঁদের সঙ্গীত পদ্ধতি পরস্পারের অনুরূপ ছিল। এঁদের সঙ্গীতে উজ্জ্বলরসের যেমন আধিক্য দেখতে পাই—এঁদের ছন্দে তেমনি পাই একটা লীলায়িত লাস্য। হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে এঁরা সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য প্রচুর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা অযোধ্যা, বেতিয়া, রেওয়া, টংক প্রভৃতি দরবারেই অধিকাংশ সময় যাপন করতেন। শিষ্য এঁদের অনেক ছিল। অনেক গুণী আছেন, যাঁরা গুণ ও বিদ্যার প্রসারে বিশেষ পটু নন, যদিচ তাঁরা স্রষ্টা ও গুণী হিসাবে খুব মহনীয় স্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের অন্তঃকরণ অতিরিক্ত কেন্দ্র-মুখী হওয়ায় তাঁরা বিদ্যা ছড়াতে পারেন নি। জাফর খাঁ ও তাঁর স্বনামধন্য তিন পুত্র কাজাম আলি, সাদেক আলি ও নিসারালি খাঁর নাম এ ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। এঁদের নাম সঙ্গীত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকবে। কিন্তু এঁদের কলাসৃষ্টি এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে—আজ তার কোনও চিহ্ন কোথাও নাই। কিন্তু প্যার খাঁর কলা-সৌন্দর্য জাফর খাঁর সৃষ্টি থেকে গরিমাময় না হ'লেও তার প্রসার ছিল অনেক ব্যাপ্ত। প্যার খাঁর সঙ্গীত দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল কারণ তিনি সৌন্দর্য বিতরণ করতে জানতেন। প্যার খাঁর শিষ্যও

ছিল অসংখ্য। তবে তাঁদের মধ্যে তাঁর ভাগিনেয় বাহাদুর সেন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বেতিয়ার রাজা নন্দকিশোর ও টংকের নবাব হসমত জঙ্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওমরাও খাঁর শিষ্যও কম ছিল না। তাঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ বীণকার খুব গুণী ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর দুই শিষ্য কুতবুদ্দৌলা ও গোলাম মহম্মদ খাঁ খুব প্রসিদ্ধ। কুতবুদ্দৌলা একজন অমাত্য ছিলেন, তিনি অযোধ্যার নবাবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। কোনও কারণে নবাব ওমরাও খাঁর উপর কোপান্বিত হওয়ায় কুতবুদ্দৌলা ওমরাও খাঁকে সেই গুরুতর বিপদ হ'তে রক্ষা করেন। ওমরাও খাঁ তাই কুতবুদ্দৌলাকে উত্তমরূপে সেতার ও বীণা শিক্ষা দেন। গোলাম মহম্মদ খাঁও ওমরাও খাঁর খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তবে তাঁকে বীণা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ওমরাও খাঁ তাঁকে বড় সেতার তৈরী করে তাতেই আলাপ শিখিয়েছিলেন—এইভাবেই 'সুরবাহার' যন্ত্রের উৎপত্তি হয়। গোলাম মহম্মদ খাঁর পুত্র বিখ্যাত সুরবাহারী সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁর নাম কলিকাতার সঙ্গীতরসিকেরা নিশ্চয়ই জানেন। সাজ্জাদ মহম্মদ সুদীর্ঘকাল মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের সভা-বাদক ছিলেন। কলিকাতায় তাঁর তুল্য সেতারী এবং সুরবাহার বাদক কখনও আসে নি। চলিত কথায় এখনও সবাই বলে "সাজ্জাদ মহম্মদের সঙ্গে সুরবাহার যন্ত্রও মরে গেছে"।

জাফর খাঁ ও প্যার খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসৎ খাঁর নাম

বঙ্গদেশে সুপরিচিত। বাসৎ খাঁ উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতনায়ক যথার্থ ছিলেন। গত শতাব্দীতে তাঁর তুল্য প্রতিভাশালী সঙ্গীত-ক্ষেত্রে আর কেহ ছিলেন না। বাসৎ খাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ছজ্জু খাঁ তখন দিল্লী দরবারের প্রতিষ্ঠাশালী গায়ক ও বাদক—তাই সম্ভবত বাসৎ খাঁর দিল্লী নগরেই জন্ম। ছজ্জু খাঁর অপর ভ্রাতা জ্ঞান খাঁ নিঃসন্তান ও ফকীর ছিলেন। অপুত্রক জ্ঞান খাঁ তাই বাসৎ খাঁর বাল্য-কালেই ছজ্জু খাঁর নিকট হ'তে তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বাসৎ খাঁ জ্ঞান খাঁর নিকটেই দীক্ষিত ও শিক্ষিত। ছজ্জু খাঁর অপর পুত্রদ্বয় জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষা ও পারদর্শিতালাভ করেছিলেন সন্দেহ নাই কিন্তু বাসৎ খাঁর শিক্ষা আরো সর্বতোমুখী ছিল। বাসৎ খাঁ শুধু গান বাজনা বা সঙ্গীতবিদ্যা নয় সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র ও পার্শী ভাষায়ও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন ও ফকীর জ্ঞান খাঁর প্রভাবে আবাল্য মানুষ হওয়ায় বাসৎ খাঁর ভিতরে ধর্মভাবের বিকাশ খুবই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। বাসৎ খাঁ পরিণত জীবনে একজন যথার্থ যোগীপুরুষ হ'তে পেরেছিলেন। জ্ঞান খাঁ প্রকৃতই নাদযোগের যোগী ছিলেন। তিনি বাসৎ খাঁকে বাল্য বয়সে সর্বদা কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতেন। বাসৎ খাঁর উপর তাঁর স্নেহ খুবই প্রবল ছিল। শোনা যায় বাসৎ খাঁর শিক্ষা-রম্ভের পর বার বৎসর রবাবে শুধু সর্গম ও নানাবিধ অলঙ্কারই অভ্যাস করতে হয়েছিল—তারপর জ্ঞান খাঁ বাসৎ খাঁকে নানাবিধ রাগ রাগিণী বাজাতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাসৎ খাঁর

রবাবের হাত যেমন অতি সুমিষ্ট ছিল তাঁর কণ্ঠও তেমনি সুমধুর ছিল। দুঃখের বিষয় বাসৎ খাঁ যৌবন উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই রবাবযন্ত্র ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, যে একবার লক্ষ্ণৌর দরবারে কোনও সাধু মৃদঙ্গী এসে প্রতিযোগিতার জন্য সকল গুণীদের আহ্বান করেন—তাঁর মৃদঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতে কোনও গুণীই গাইতে বা বাজাতে পারলেন না, কেননা সাধুর লয়ের উপর যেরূপ অধিকার ছিল হাতও সেরূপ অসামান্য তৈয়ারী ছিল। যখন সকল গুণীরাই একে একে পরাজিত হ'লেন তখন বাসৎ খাঁ রবাব নিয়ে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হলেন। বাসৎ খাঁর নিকটে কিন্তু সাধুরই পরাজয় ঘটল। তখন সাধু বাসৎ খাঁর উপর আভিচারিক কোনও অনুষ্ঠান করায় বাসৎ খাঁর দক্ষিণ হস্ত বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তাই শেষজীবন পর্যন্ত বাসৎ খাঁ আর বাজাতে পারেন নি। তবে কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিখিলজনমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও ভাবে বিহ্বল ক'রে গেছেন। একবার তাঁর বিরচিত "দেশ" রাগিণীর একটি গান শুনে ওয়াজেদ আলি শা বাদশা আপন বহুমূল্য হীরকহার কণ্ঠ হ'তে খুলে বাসৎ খাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাসৎ খাঁ লক্ষ্ণৌর দরবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর কলিকাতায় এসে বৎসরাধিক কাল মেটিয়াবুরুজে বন্দী ওয়াজেদ আলি শা'র নিকট ছিলেন। সে সময় সুপ্রসিদ্ধ ধার্মিক ও বিদ্বান ভূপতি হরকুমার ঠাকুর মহোদয় তাঁর নিকট রবাব ও সেতার শিক্ষা করেন। হরকুমার ঠাকুর একজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি সাধকাগ্রণী ছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর যেরূপ অসামান্য অধিকার

সঙ্গীত-সাধনায়ও সেরূপই তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতায় একটি বিরাট সভা আহ্বান ক'রে বহু পণ্ডিত ও গুণীসমক্ষে বাসৎ খাঁ সাহেবকে দশসহস্র টাকা পারিতোষিক সহ তাঁকে "সঙ্গীতনায়ক" উপাধিতে ভূষিত করেন। বাসৎ খাঁ সাহেবও হরকুমার ঠাকুর মহোদয়কে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন যে ঠাকুর মহোদয় তাঁর যথার্থ সঙ্গীত-শিষ্য। বাসৎ খাঁ কলিকাতায় অবস্থান কালে বিখ্যাত রবাবী কাশিম আলি খাঁ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাশিম আলি খাঁ বাসৎ খাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা জাফর খাঁর পৌত্র ছিলেন। কাশিম আলি খাঁর তুল্য যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী বঙ্গদেশে কখনও কেহ আসেন নি। বাসৎ খাঁর শিক্ষাতেই কাশিম আলি খাঁ এত দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। বাসৎ খাঁর অপর শিষ্য নিয়ামতুল্লা খাঁ স্বরোদীও ভারতে সুবিখ্যাত। নিয়ামতুল্লার পুত্র কৌকভ খাঁ আজ জগদ্বিখ্যাত। কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবও নিয়ামতুল্লার অপর পুত্র। কলিকাতা মহানগরী কেরামতুল্লা খাঁ সাহেব ও কৌকভ খাঁ সাহেবের গুণপণার কথা কখনও ভুলতে পারবে না। কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের স্বরোদ শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে ও যাঁরা তাঁর প্রকৃত তালিমের বাজনা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে কি বস্তু কেরামতুল্লা খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আজ ভারত হতে লোপ পেয়েছে। স্বরোদে রবাবের অঙ্গে আলাপ যদি কোথাও কেহ বাজাতে পেরে থাকেন, তবে নিয়াম-তুল্লা খাঁ সাহেব ও তাঁর পুত্ররাই শুধু পেরেছেন। অন্যান্য স্বরোদী বীণা ও সুরবাহারের অঙ্গ নিয়েছেন কিন্তু এঁরাই প্রকৃত

ধরাব-অঙ্গে বাজাতেন। বাসৎ খাঁ সাহেবের মাত্র ছয় মাসের তালিমে নিয়ামতুল্লা খাঁ সাহেব ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বরোদী হতে পেরেছিলেন। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি বাসৎ খাঁ সাহেব কি প্রকার গুণী ও প্রতিভাশালী ছিলেন।

মেটিয়াবুরুজে বাদশা ওয়াজেদ আলি শার সঙ্গীত সভায় বাসৎ খাঁ সাহেব দেড় বৎসরকাল অবস্থিতির পর রাণাঘাটের জমিদার পাল চৌধুরী মহোদয়দের আমন্ত্রণে কয়েক মাসের জন্য রাণাঘাটে ছিলেন। এই সময় ওয়াজেদ আলি শার মৃত্যু হয়। বাসৎ খাঁ সাহেব তাই অন্য কোনও দরবারে যাবেন মনস্থ করছিলেন। পাল চৌধুরীরা বিশেষ সম্মানের সহিত বাসৎ খাঁ সাহেবকে রাণাঘাটে রেখে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের সংগীত ও সাহিত্য প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহ ছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে পাল চৌধুরীদের কাব্যোৎসাহের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সঙ্গীতেও তাঁরা খুবই অনুরাগী ছিলেন।

বাসৎ খাঁ যথার্থ সঙ্গীতানুরাগীদের অকপটে ও প্রাণ খুলে শিক্ষা দিতেন কিন্তু যারা প্রকৃত সঙ্গীত সেবক নয়, মাত্র সখের জন্য সঙ্গীত চর্চা করে, তাদের কিছুতেই শেখাতেন না। শিক্ষা বিষয়ে তিনি অর্থের দিকে মোটেই লক্ষ্য করতেন না। তিনি চাইতেন নাদবিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি। যেখানে এই ভক্তি দেখতেন সেখানেই তিনি মুক্তহস্তে বিদ্যা বিতরণ করতেন। শিষ্যদের তিনি এত শেখাতেন, যে তারা শিখে শেষ করতে পারত না। রাজা হরকুমার ঠাকুরকে তিনি আন্তরিক স্নেহ

করতেন ও তাঁর অতি-গুপ্ত বিদ্যা সম্পদ তাঁকে দান করেছিলেন। হরকুমার ঠাকুর তাঁর শিষ্য হবার পর প্রথম কয়েক মাস তাঁকে তিনি কিছুই শেখান নি। শুধু সর্গম সাধনা করতে বলতেন। কয়েক মাস পর ঠাকুর মহাশয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ভাবে শিক্ষা করলে কতদিনে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে? বাসৎ খাঁ তখন তাঁকে বললেন, যে এক্ষণে তাঁর শিক্ষার সময় হয়েছে। তারপর তিনি তিন মাসে এত শেখালেন, যে হরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের আকাঙ্খার আর কিছুই বাকী রইল না। শিক্ষার এমন কৌশল তিনি জানতেন যে অতি অল্প সময়েই শিষ্যকে সঙ্গীতের অতি গূঢ় ও দুরূহ বিষয়েও পারদর্শী ক'রে তুলতেন। মাত্র ছয় মাসের শিক্ষায় ঠাকুর মহোদয় রবাবে ও সেতারে অতি উচ্চশ্রেণীর যন্ত্রসঙ্গীত আয়ত্ত করতে পারলেন।

বঙ্গদেশে দেড়বৎসর অবস্থিতির পর গয়ার নিকটবর্তী টিকারি রাজ্যের অধিপতির নিমন্ত্রণে বাসৎ খাঁ গয়ায় গমন করেন। তাঁর অন্তিম জীবন গয়াতেই অতিবাহিত হয়। টিকারি রাজা বাসৎ খাঁকে একটা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সে সময় টিকারি রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। প্রজাদের মধ্যে তখন হাহাকার উপস্থিত। টিকারির রাজা বাসৎ খাঁকে আহ্বান ক'রে বললেন, "খাঁ সাহেব! আপনার পূর্বপুরুষগণ সংঙ্গীতের প্রভাবে অরণ্যে আগুন জ্বালতে পারতেন, আকাশ হ'তে বৃষ্টিধারা নামাতে পারতেন! আপনি এক্ষণে এই অনাবৃষ্টি দূর করুন! আপনি মেঘের গান গাইলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে!" বাসৎ খাঁ তখন মহারাজকে বললেন,

"মহারাজ! আমার পূর্বপুরুষগণ মহাযোগী ছিলেন, কিন্তু আমি ঘোর সংসারী মানুষ—স্ত্রী পুত্রদের ভরণপোষণ চিন্তায় মগ্ন—শুধু দুবেলা ভগবানের নাম নিই মাত্র! আমার গানে কি বর্ষা নামবে?" মহারাজ কিন্তু বাসৎ খাঁকে কিছুতেই ছাড়লেন না—বাসৎ খাঁকে মেঘ ও মল্লারের আলাপ ও গান গাইতে হ'ল। বিধির কৃপায় কিন্তু অঘটন ঘটল—বহুদিনের অনাবৃষ্টির পর সেদিনই মেঘ ক'রে বৃষ্টি নামল। বাসৎ খাঁ অবশ্য জানতেন যে এটা নেহাত দৈবকৃপা। কিন্তু মহারাজার কেমন এক প্রত্যয় হ'ল যে বাসৎ খাঁর সঙ্গীতের ফলেই অনাবৃষ্টির নিবারণ হ'ল। মহারাজা তখন বাসৎ খাঁকে বহু ভূসম্পত্তি নিষ্করভাবে তালুক দিয়ে দিলেন। টিকারি রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট কয়েকটি গ্রাম পুরুষানুক্রমে বাসৎ খাঁ পেলেন। দেহান্তকাল অবধি বাসৎ খাঁ তাই টিকারী রাজ্য পরিত্যাগ করেন নাই। গয়ার কয়েকজন ধনী পাণ্ডাও ঐ সময় বাসৎ খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও বাসৎ খাঁর উপস্থিতিতে গয়া সঙ্গীতের এক প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। গয়ার পাণ্ডাগণ বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রদত্ত পিণ্ডসহ যাত্রীদের দক্ষিণার এক অংশ ঐ সময় বাসৎ খাঁ সাহেবের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছিলেন।

বাসৎ খাঁ অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁর পরমায়ু শতবর্ষ অতিক্রম করেছিল। গয়ায় তিনি অধিকাংশ সময়ই সাধন ভজনে নির্বাহ করতেন। দেবদেবীগণের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন—ফকীরী যোগ সাধনা ও হিন্দু ভক্তি সাধনা উভয়ই তাঁর মধ্যে সমভাবে ক্রিয়া করেছে। অহর্নিশ তিনি নাম-

জপ করতেন ও প্রাণায়ামেও তিনি বিলক্ষণ অগ্রসর ছিলেন। তাই তাঁর অতি দীর্ঘ নীরোগ জীবন্ সম্ভব হয়েছিল। বাসৎ খাঁ সাহেবের রচিত ধ্রুপদগুলি পাঠ করলে তাঁর হৃদয়ের ভক্তি ও রসের পরিচয় আমরা খুবই পাই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাসৎ খাঁ গয়াধামে তিন পুত্র ও এক কন্যার সামনে সজ্ঞানে ঈশ্বরপদারবিন্দ ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে ইহলীলা সংবরণ করেন। বাসৎ খাঁর ন্যায় কৃতী ও সাধক সঙ্গীত জগতে সত্যই বিরল। সেনীবংশেও তাঁর ন্যায় সদানন্দ, নিরভিমান, ভগবৎ নিষ্ঠ নাদ বিদ্যার পরাকাষ্ঠায় উপনীত অপর কোনও সঙ্গীত সাধকের উদাহরণ দুর্লভ।

জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসৎ খাঁর সঙ্গীত বিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সাদেক আলী খাঁ, বাহাদুর সেন খাঁ ও আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া)। সাদেক আলি খাঁ জাফর খাঁর পুত্র, বড়কু মিয়াও বাসৎ খাঁর পুত্র কিন্তু বাহাদুর সেন প্যার খাঁর ভাগিনেয়। প্যার খাঁ বিবাহ করেন নাই—তিনি তাঁর ভাগিনেয়কেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন ও সঙ্গীত বিদ্যার উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। সাদেক আলি ও বাহাদুর সেন সমবয়সী ও সঙ্গীত বিদ্যায় অতি তীব্র প্রতিযোগী ছিলেন। বাসৎ খাঁর পর এঁদের স্থান সঙ্গীতমণ্ডলে বিশেষ উন্নত হ'য়ে উঠেছিল। সাদেক আলির অন্য আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন। কাজাম আলি খাঁ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ, তৎপর সাদেক আলি নিসারালি ও আমেদ আলি। আমেদ আলি অল্লায়ু ছিলেন। তাই

সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি নিজ গুণপনার পরিচয়ের অবসর পান নি। অপর তিন ভ্রাতাই ভারতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে গেছেন। বঙ্গ-বিখ্যাত রবাবী কাশিম আলি খাঁ কাজাম আলি খাঁর পুত্র। কাশিম আলি খাঁর নাম বাংলা আজও ভোলে নি—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতার নামও অমর হয়ে থাকবে। আর সাদেক আলি খাঁকে হিন্দুস্থান কখনও ভোলে নি বা ভুলবে না—কেননা সাদেক আলি অতি শক্তিশালী বাদক ছিলেন ও সঙ্গীত বিদ্যার একজন প্রমাণস্বরূপ ছিলেন। সাদেক আলির মত সুপণ্ডিত কোনও গুণী বাসৎ খাঁর পর আর দেখা যায় নি। বাসৎ খাঁর ন্যায় ইনিও সংস্কৃত ভাষা উত্তম পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষা করেছিলেন ও সঙ্গীত বিষয়ক সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তবে পাণ্ডিত্য সাদেক আলিকে শুষ্ক করে তোলে নি। পাণ্ডিত্য সাদেক আলির সঙ্গীত সৃষ্টিকে জ্ঞান গরিমায় মণ্ডিত করেছে ও বিদ্যার গভীর রসস্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। প্রকৃত বিদ্যা কখনও শুষ্কতা আনয়ন করে না—স্বয়ং বীণাপাণি বাণী বিদ্যাস্বরূপিণী, তাই রসের কি কিছু অভাব তাঁর আছে? আমরা বিদ্যার গভীর রসস্তরে প্রবেশ না করে শুধু বাহিরের ব্যাকরণ অলঙ্কার নিয়ে মাথা ঘামাই বলে মনে করি বিদ্যা রসের অন্তরায়, কিন্তু এটা মস্ত ভুল। মস্তিষ্কের শুষ্ক বিদ্যা-চর্চা নীরস হতে পারে কিন্তু যে বিদ্যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় তাহা রসের ভাণ্ডার স্বরূপ।

এই রসভাণ্ডারে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলেই জাফর

খাঁ, বাসৎ খাঁ ও সাদেক আলি প্রাণহীন রসহীন ওস্তাদ মাত্রে পরিণত হন নি—অতি সমৃদ্ধ জ্ঞানসম্পদে পূর্ণ ও প্রগাঢ় রসের রসিক, অনন্যসুলভ কলাবিদ ও তন্ত্রকাররূপে নিজ নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার সৃষ্টিতে হিন্দুস্থানকে মহিমান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অপরদিকে বাহাদুর সেনের মধ্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। বাহাদুর সেনের সঙ্গীতে প্রগাঢ় রসের পরিচয় আমরা তত পাই না কিন্তু তাঁর রঞ্জিনী শক্তি এত বেশী ছিল যে হিন্দুস্থানে লোকরঞ্জন গুণে বাহাদুর সেনের পদ সকলকে অতিক্রম করেছিল। বাহাদুর সেন প্যার খাঁর নিকট রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর হাতে বিধিদত্ত এক অসামান্য মিষ্টতা ছিল। এই মিষ্টতার গুণে তিনি সকলেরই চিত্ত জয় করে ফেলতেন। কিন্তু বাহাদুর সেনের ধীশক্তি ছিল না, তাই রাগ রাগিণীর গূঢ় স্বরূপ ও রাগ রাগিণীর স্বধর্ম ও লীলার মূল রহস্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। রাগরাগিণীর ব্যবহারে তাঁর কিন্তু কোনও গলদ প্রকাশ পেত না এবং মিষ্টতার গুণে তিনি যাই বাজাতেন তার পর আর কাহারও গান বাজনা মোটেই জমত না। তাঁর কলা সৃষ্টিতে জ্ঞানের দৃষ্টি ছিল না—কিন্তু ছিল একটা স্বতঃসিদ্ধ আবেগ যা ভুল ভ্রান্তি করে না ও আনন্দের তন্ময়তায় স্রষ্টা ও শ্রোতা উভয়কেই আত্মহারা করে দেয়। বস্তুতঃ বাহাদুর সেন নিজে কি যে অপরূপ বস্তু সৃষ্টি করতেন, তদ্বিষয়ে তিনি নিজে অজ্ঞান ছিলেন না।

তাঁর সৃষ্টি খুব সুন্দর হ'লেও জ্ঞানের অভাবে বহুমুখী সমৃদ্ধতায় বিচিত্র ও নবোন্মেষের ক্ষমতায় বৃহৎ হ'য়ে ওঠে নাই। হাতের মিষ্টত্ব কম হ'লেও সাদেক আলীর স্থান তাই বাহাদুর সেনের উর্ধ্বে। ইঁহারা যখন শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে লোকালয়ে বাজনার প্রথম প্রবেশানুমতি পান তখন ইঁহাদের পারিবারিক একটি প্রকাণ্ড সম্মেলন কাশীধামে অনুষ্ঠিত হয়। প্যার খাঁ এই সঙ্গীত সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনে কাশীধামের তদানীন্তন বিখ্যাত সকল গায়ক ও বাদক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্যাব খাঁ বাহাদুর সেনের শিক্ষা সাঙ্গ ক'রে জনসমাজে তাঁকে যথার্থ পদ অধিকারের সুবিধা দিবার জন্যই এই জলসার অনুষ্ঠান করেছিলেন; আরও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কাজাম আলী, সাদেক আলী প্রভৃতিকে বাহাদুর সেনের গুণপনায় অভিভূত ক'রে ফেলা। প্যার খাঁ চেয়েছিলেন তাঁর ভাগিনের যাতে হিন্দুস্থানবিজয়ী হ'তে পারে। এ বিষয়ে ভ্রাতষ্পুত্রদের প্রতি পক্ষপাতের তাঁর কিঞ্চিৎ অভাব ছিল।

সে জলসায় সবাইকেই শুধু বেহাগ রাগিণী গাইতে ও বাজাতে বলা হ'ল। প্রথমে কাশীর সকল গুণীগণ একে একে কণ্ঠে বা বীণায় বেহাগের আলাপ করলেন। তৎপর বাহাদুর সেনের ডাক পড়ল। বাহাদুর সেনের তালিমে প্যার খাঁ খোসরঙের সমাবেশ এ ভাবে দিয়েছিলেন যে রঞ্জিনী শক্তিতে বাহাদুর সেনের বেহাগএর আলাপে উপস্থিত গুণী-মণ্ডলী মুগ্ধ ও বিহ্বল হ'য়ে পড়লেন। বাহাদুর সেন দুই

ঘণ্টা বেহাগ-এর আলাপ বাজিয়ে যখন সুরশৃঙ্গার থামালেন তখন প্যার খাঁ উচ্চকণ্ঠে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের আহ্বান ক'রে বললেন "এস, তোমরা এর উপর যদি কিছু বাজাতে পার তো বাজাও।" সাদেক আলী খাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাজাম আলী খাঁ তখন রবাবে "বেহাগ"-এর আলাপ শুরু করলেন। সুরশৃঙ্গারে সুঁৎ ও চিকারির ঝঙ্কার সহযোগে যে শ্রুতিসুখকর ও রঞ্জনগুণ মনোহর আলাপ সম্ভব রবাবে তা সম্ভব নয়, রবাবের গম্ভীর নাদে যে আলাপ উৎপন্ন হয় তার রস অন্য-রূপ। কিন্তু রবাবের ছন্দের বৈচিত্র্য সুরশৃঙ্গার অপেক্ষা অধিক। কাজাম আলী যখন অস্থায়ী অন্তরা শেষ ক'রে এক অচিন্ত্যপূর্ব পথে আভোগের তান শুরু করলেন তখন বেহাগের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এত খুলে গেল যে, যেন মেঘের রুদ্ধ কবাট ভেদ করে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত হ'ল। সমবেত গুণীমণ্ডলী "হা হা" শব্দে এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের রোল তুলে দিল। কাজাম আলী তখন বাজনা থামিয়ে প্যার খাঁকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "কাকা মিয়া! আপনি এ তালিম কি বাহাদুর সেনকে দিয়েছেন?" প্যার খাঁ তখন মস্তক নত ক'রে কাজাম আলীর কাছে এসে তাঁর হাত দু'টি ধ'রে বললেন "কাজাম! এ তালিম তোমাদেরই জন্য! বাহাদুর সেনের বাজনা যেন হীরার কলস! তাতে রোসনির অভাব নাই কিন্তু রাগের অমৃতকুণ্ড তোমরাই পেয়েছ— তোমাদের মাটির কলস, কিন্তু তাতে রয়েছে পবিত্র তীর্থ সলিল! তোমাদের রোসনির অভাব কিন্তু বাহাদুর সেনের

ঘড়ায় জলের অভাব। রঙের জৌলুষে বাহাদুর সেন হিন্দুস্থান মাতিয়ে দেবে কিন্তু বিদ্যার পূর্ণকুম্ভ সাদেক আলীরই অধিকারে রয়েছে।”

বাহাদুর সেন খাঁ সাহেব ও সাদেক আলী খাঁ সাহেবের শিক্ষার কথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে লিখেছি। গত শতাব্দীতে ইহাদের তুল্য তন্ত্রকার ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। শিক্ষা সমাপনের পর ইঁহারা উভয়েই হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট দরবারে অতি শ্রদ্ধেয় পদ পেয়েছিলেন। সাদেক আলী খাঁ সাহেব প্রথম অনেক দিন বেতিয়া রাজদরবারে ছিলেন পরে বারানসী নরেশের নিকট ছিলেন, বারানসীতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সাদেক আলী খাঁ তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। একবার বেতিয়ার মহারাজা তাঁকে এক মাসের জন্য ছুটি দিয়েছিলেন, কিন্তু সাদেক আলী খাঁ ছুটির সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে যোগ না দেওয়ায় মহারাজা অসন্তুষ্ট হন। সাদেক আলী খাঁ তৎক্ষণাৎ বেতিয়ার কর্ম পরিত্যাগ ক'রে বারানসীর প্রধান সঙ্গীতজ্ঞের পদ অধিকার করেন।

সাদেক আলী খাঁর রাগ-রাগিণীর উপর অধিকার অসাধারণ ছিল—ইচ্ছামত রাগ-রাগিণী তিনি ভেঙে নূতন ক'রে গড়তে পারতেন। একবার জয়পুরে তিনি কোমল রেখাব দিয়ে আগাগোড়া দরবারী কানাড়ার আলাপ বাজিয়ে গেলেন অথচ তা এত সুন্দর হ'ল যে কোনও দোষ তাতে কেহ ধরতে পারল না। সাদেক আলী খাঁর বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুস্থানে কেহ হয় নাই, হ'তে সাহস করে নি।

সাদেক আলি বিবাহ করেন নি, তাঁর উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিসারালি খাঁ। নিসারালি খাঁ সাদেক আলির সঙ্গে সঙ্গে কাশীধামে থাকতেন ও সাদেক আলির মৃত্যুর পর কাশী-নরেশের সঙ্গীতগুরু পদে বৃত হন। নিসারালি খাঁর অন্তঃকরণ খুব উদার ছিল, তিনি উত্তম শিষ্য তৈয়ার ক'রে গিয়েছেন।

নিজ ঘরানা গুণীদের মধ্যে বঙ্গ-বিখ্যাত কাশিম আলি খাঁ রবাবীই এঁদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। কাশিম আলি খাঁ সাদেক আলির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজাম আলির একমাত্র পুত্র। তিনি আপন পিতা ও পিতৃব্যদের নিকট বীণা ও রবাবের শিক্ষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। নিসারালির অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে বারাণসীর বৈদ্য অর্জুনদাস নামক একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কবিরাজ ও পান্নালাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই সুরশৃঙ্গার ও সেতারের উত্তম শিক্ষা পেয়েছিলেন। উজীর খাঁ সাহেবও বাল্যকালে নিসারালির কাছে রবাব শিখেছিলেন। উজীর খাঁ সাহেব নিসারালির দৌহিত্র ছিলেন।

অপরদিকে বাহাদুর সেন খাঁ রামপুরের তদানীন্তন নবাব কাম্বে আলি খাঁ বাহাদুরের সঙ্গীতগুরু পদপ্রাপ্ত হয়ে রামপুরেই জীবনকাল অতিবাহিত করেন। বাহাদুর সেনের বাজনার রঞ্জিনী শক্তির কথা পূর্বে বলেছি। `সাদেক আলির রাগ গঠনের শ্রেষ্ঠতার যেমন তুলনা হয় না, তেমনি বাহাদুর সেনের লালিত্য ও উন্মাদিনী শক্তিরও উপমা নেই। সঙ্গীতের উন্মাদিনী

শক্তিতে বনের পশু আকৃষ্ট হয়ে আসে আমরা লোক মুখে শুনেছি। কিন্তু রামপুরের অবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জানে যে, মুটে মজুরেরা মোট মাথায় নিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে যখন বাহাদুর সেনের বাড়ি অতিক্রম করত, তখন যদি যোগিন খাঁ সাহেব রেঁয়াজ করতেন, তা'হলে তাদের মাথার মোট মাথায়ই থাকত আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুঁস হয়ে তারা বাজনা শুনত। বাজনা থামবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের কাজকর্ম সব ভুল হয়ে যেত। বাহাদুর সেনের বাজনা শুধু ওস্তাদদের নয়, অশিক্ষিত লোকদেরও চিত্ত কেড়ে নিত।

বাহাদুর সেনের শিষ্য ছিল অসংখ্য। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা খুব বিলিয়ে গেছেন। তাঁর সন্তান ছিল না, তাই তিনি বালক উজীর খাঁকে সন্তানের মত শেখাতেন। সে কথা আমরা পরে বলব। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে প্রধান শিষ্য ছিলেন নবাব কাম্বে আলি খাঁ বাহাদুরের ভ্রাতা হায়দর আলি খাঁ সাহেব। হায়দার আলী খাঁ বাহাদুর সেনের সমুদায় বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন। রবাব, বীণা ও সুরশৃঙ্গার এই তিন যন্ত্রে হায়দর আলির যেমন অসামান্য অধিকার জন্মেছিল, কণ্ঠসংগীতেও সেনীঘরানার ধ্রুবপদ, হোরি প্রভৃতি তিনি তেমনি আয়ত্ত করেছিলেন। কথিত আছে, হায়দর আলি খাঁ লক্ষ টাকা দিয়ে বাহাদুর সেনের নিকট সেনীঘরের খাঁটি শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবে তাঁর গুরুও অসাধারণ প্রকৃতির ছিলেন, সমুদয় বিদ্যা শিষ্যকে শেখাবার পর গুরু বাহাদুর সেন হায়দর আলি খাঁকে সেই লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন—

বিদ্যা কখনও অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয় না। বিদ্যারম্ভে তিনি অর্থ নিয়েছিলেন শুধু শিষ্যের মন পরীক্ষার জন্য। এমন নিঃস্বার্থ ও উদারচেতা গুরু জগতে দুর্লভ!

রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে যখন সাদেক আলি খাঁ ও বাহাদুর সেন খাঁ আপন প্রতিভা ও কলাসৃষ্টির সৌন্দর্যে দেশ মোহিত করছিলেন ঐ সময় বীণকার-বংশের প্রতিনিধিরূপে আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ, ওমরাও খাঁ সাহেবের দুই পুত্র। ওমরাও খাঁ সাহেব বীণাযন্ত্রে ভারতে অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁর কথা আমরা পূর্বে বলেছি। সুপ্রসিদ্ধ সুরবাহার যন্ত্রপ্রবর্তক গোলাম মহম্মদ খাঁ ও তৎপুত্র কলিকাতার বিখ্যাত সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ ওমরাও খাঁ সাহেবেরই কৃপাকণা পেয়ে এত গুণপনার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। বান্দার নবাব হসমত জঙ্গ সাহেব সুরবাহারে ওমরাও খাঁর শিক্ষায় ভারতের সৌখীন গুণী সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করেন। ওমরাও খাঁ লক্ষ্ণৌ বান্দা ও শেষ জীবনে রেওয়ারাজ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ তাঁরই দুই পুত্র।

ইঁহারা পিতার মৃত্যুকালে রেওয়ারাজ্যে ছিলেন। সেখানে কয়েক বৎসর যাপন করে পরে দুই ভ্রাতা উত্তর ভারতে গমন করেন। আমীর খাঁ রেওয়া হতে লক্ষ্ণৌ ও পরে রামপুর দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। রহিম খাঁ বান্দা স্টেটেই অধিকাংশ সময় থাকতেন—মাঝে মধ্যে রামপুরে আসতেন। রহিম খাঁ বীণাযন্ত্রে সে সময় অতুলনীয় গুণীরূপে হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

তাঁর হাত যেমন তৈয়ারী সেইরূপই সুমিষ্ট ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন ও তাঁর পুত্রসন্তান হয়নি। তিনি তাঁর বীণার সমুদয় বাদন পদ্ধতি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আমীর খাঁর পুত্র বালক উজীর খাঁকেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর অন্য উল্লেখযোগ্য শিষ্যের মধ্যে পরলোকগত স্বরোদবাদক আজগর আলির নাম করা যেতে পারে। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বরোদী হাফেজ আলি খাঁকে বাংলার রসিকরা সকলেই চেনেন। আজগর আলি খাঁ হাফেজ আলির জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য পুত্র। আজগর আলি দ্বারভাঙ্গা স্টেটে বিশেষ সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রহিম খাঁ সাহেবের লোকান্তর প্রাপ্তির পর আমীর খাঁ সাহেব বীণকার ঘরের একমাত্র উজ্জ্বল রত্নরূপে অনেকদিন বিরাজিত ছিলেন। ঐ সময় রবাবাবংশের অনেক গুণী হিন্দুস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বাহাদুর সেন ও সাদেক আলি খাঁর কথা পূর্বেই বলেছি। তাঁদের কনিষ্ঠ নিসারালি খাঁ, বাসৎ খাঁ সাহেবের পুত্র আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া), সাদেক্ আলির ভ্রাতুষ্পুত্র বঙ্গ বিখ্যাত কাশিম আলি খাঁ, ইহারা সকলেই তখন নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রতিভার গৌরবে ও দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। প্রত্যেকেই হিন্দুস্থানের বিশেষ বিশেষ অংশে গুরুরূপে পূজিত।

বীণকার ঘরের পূর্বতম পুরুষ মিশ্রীসিংহজী রবাবীবংশের স্রষ্টা মিয়া তানসেনের দুহিতা সরস্বতী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন ইহা আমরা জানি। এই দুই বংশের মধ্যে

পরস্পর বিবাহাদির আদান প্রদান মাঝে মাঝে হয়ে এসেছে। সর্বশেষে আমীর খাঁ সাহেব রবাবি ঘরের কন্যা বিবাহ করেন। সাদেক আলি খাঁ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী অর্থাৎ কাজাম আলি খাঁর কন্যা রামপুরে বাহাদুর সেনের ঘরেই লালিত হয়েছিলেন। বাহাদুর সেন সেই কন্যাকে আমীর খাঁ সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। বিগত-যুগের সঙ্গীতনায়ক স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেব এই বিবাহেরই সুবর্ণফল।

তানসেনের বংশে সকলকেই গান ও বাজনা উভয় প্রকার শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে। গুণীগণ আপন আপন রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী কেহ কণ্ঠসঙ্গীতের অধিক অনুশীলন করেন, কেহ বা যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা অধিক করেন। এই রীতি পূর্বাপর চলে এসেছে। আমীর খাঁ সাহেব বীণার দ্বাদশাঙ্গ সমুদয় তন্ত্রবিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ছিল অসামান্য মিষ্ট। তাঁর বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরের তুলনা তৎকালে ছিল না। তাই যন্ত্রসঙ্গীতের অনুশীলনের ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রহিম খাঁর উপর দিয়ে তিনি কণ্ঠসঙ্গীতেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন।

আমীর খাঁ যখন রামপুরে এলেন, তখন বাহাদুর সেন খাঁ নবাব কাল্বে আলি খাঁর গুরুপদে সমাসীন। বাহাদুর সেন আমীর খাঁর বিবাহের পর অতি সমাদরের সহিত তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন। বাহাদুর সেন তখন হিন্দুস্থানে সূর্য-সদৃশ নিজ গৌরবময় দীপ্তিতে দশদিক আলো ক'রে বিরাজিত ছিলেন, কিন্তু আমীর খাঁর হোরি ধ্রুপদের স্নিগ্ধ মধুর রশ্মির

প্রভাও বড় কম ছিল না—তাহা চন্দ্রকিরণের ন্যায়ই প্রাণমন সঞ্জীবন ছিল। বাহাদুর সেন খাঁ সুরশৃঙ্গার বাজাবার পর অন্য কোনও সঙ্গীত জমানো দুঃসাধ্য হ'ত কিন্তু আমীর খাঁর মধুর স্বরলহরী সুরশৃঙ্গারের সুরকে যেন আরো সমুজ্জ্বল ক'রে তুলত। বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁ দীর্ঘদিন রামপুর দরবারে একসঙ্গে একই আসরে অসাধারণ প্রতিভা ও গুণ-পনার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

এরূপ দুইটি প্রতিভাশালী কলাবিদকে একত্র পেয়ে রামপুব সঙ্গীত-সম্ভারে বিশেষ সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। কাম্বে আলি খাঁ নবাব বাহাদুরের বড় সাধ ছিল যে রামপুর দরবারকে দিল্লীর মোগল দরবারেরই অনুরূপ ক'রে গড়ে' তুলবেন। তাঁব সে বাসনা সত্যই সাফল্যে মণ্ডিত হয়েছিল। বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁ তখন যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে হিন্দুস্থানের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। তদ্ভিন্ন বাসরালি খাঁ খেয়ালি রামপুরে কাওয়ালি সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁ উভয়েই অনেক উপযুক্ত শিষ্যও তৈরী ক'রে রামপুর দরবারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে ছিলেন। বিদ্যা গোপন করা তাঁদের স্বভাব ছিল না। মুক্তহস্তে বিদ্যা বিতরণ করতে তাঁরা জানতেন—এমন কি শিক্ষাদান সম্বন্ধেও তাঁদের প্রতিযোগিতা ছিল। কার শিষ্য বিদ্যায় অধিক অগ্রসর হয় সেদিকেও তাঁরা দৃষ্টি রাখতেন। ফলে শিষ্যদের শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগের অভাব ছিল না। বাহাদুর সেনের শিষ্যদের মধ্যে গোলাম নবী খাঁ বীণকার ও স্বরোদী

মজরু খাঁ বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন। মজরু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ আলি খাঁ স্বরোদী মহারাজা দিনাজপুরের দরবারে ও মুক্তাগাছার স্বনামধন্য রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী মহোদয়ের দরবারে থেকে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আহম্মদ আলি খাঁর স্বরোদের হাত যেরূপ সুমিষ্ট সেরূপই দ্রুত ছিল; তাঁর বিদ্যাও যথেষ্ট ছিল। বাংলার সঙ্গীত রসিকদের নিকট আহম্মদ আলি খাঁর নাম বিশেষ পরিচিত। মজরু খাঁ তাঁরই গুরু ও জ্যেষ্ঠতাত।

আর আমীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বরোদী ফিদা হোসেনও কলিকাতায় অপরিচিত নন। ফিদা হোসেন নিখিল ভারত সঙ্গীত কনফারেন্সে চিরদিনই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ফিদা হোসেন আমীর খাঁর নিকট রবাব ও স্বরোদ শিক্ষা পেয়েছিলেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক ও সারেঙ্গীয়া মেহদি হোসেন খাঁর পিতা বনিয়াত হোসেন খাঁ, আমীর খাঁ ও বাহাদুর সেন প্রত্যেকের নিকটই শিক্ষা পেয়েছিলেন। বনিয়াত হোসেন সারেঙ্গীয়াগণের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন। মহম্মদ হোসেন বীণকারও উভয়েরই শিষ্য ছিলেন।

ইঁহারা সকলেই ওস্তাদ্ সম্প্রদায়ভুক্ত। তদ্ভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নবাব হায়দর আলি খাঁ সাহেবের কথা ইতি-পূর্বে উল্লেখ করেছি। হায়দর আলি খাঁ রামপুরের নবাব বাহাদুরের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তিনি বাহাদুর সেনের নিকট রবাব ও সুরশৃঙ্গারের সমুদয় বিদ্যা যেরূপ অধিগত

করেছিলেন, তদ্রূপ আমীর খাঁর নিকটে বীণা ও হোরি ধ্রুপদের সকল তালিম পেয়েছিলেন। তিনি উভয়েরই অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। উভয়েই নিজ নিজ ঘরের সকল গুপ্ত বিদ্যা হায়দর আলি খাঁকে দিয়ে যান। তাই হায়দর আলি খাঁ প্রকৃত-পক্ষে তাঁদের পুত্র-স্থানীয়ই ছিলেন। তাঁর বিদ্যা, ক্রিয়াপার-দর্শিতা ও প্রতিভা কোনও সেনী গুণী অপেক্ষা কম ছিল না।

উজীর খাঁ সাহেব আমীর খাঁরই পুত্র। আমীর খাঁ উজীর খাঁকে কণ্ঠসঙ্গীত ও বীণার সমুদয় অঙ্গ শিক্ষা দিবার পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। বাহাদুর সেন তৎপূর্বেই পরলোকগমন করেন। বৃদ্ধ ও মৃত্যুরোগাক্রান্ত আমীর খাঁ তাঁর প্রিয় পুত্র উজীর খাঁকে নবাব হায়দর আলি খাঁর হস্তে সমর্পণ ক'রে ইহলীলা সংবরণ করেন। উজীর খাঁ তখন কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন—কণ্ঠসঙ্গীত ও বীণার শিক্ষা তিনি তাঁর পিতা আমীর খাঁ ও পিতৃব্য রহিম খাঁর নিকট সুসম্পন্ন করেছিলেন। রবাব ও সুরশৃঙ্গারের তালিমও তাঁর দুই মাতামহ নিসারালি খাঁ ও বাহাদুর সেনের শিক্ষায় উত্তমরূপে আয়ত্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় ভারতের সুসঙ্গীত-সূর্য উজীর খাঁ হায়দর আলি খাঁর গৃহে আশ্রয় পেয়ে সঙ্গীতের একনিষ্ঠ অনু-শীলনে ব্রতী হন। উজীর খাঁর জীবনী পরে আলোচনা করা হবে। তৎপূর্বে রবাবী বংশের শেষ রত্নদিগের জীবন-বৃত্তের আলোচনা প্রয়োজনীয়। এখন আমরা বাসৎ খাঁর পুত্রদিগের ও কাশিম আলি খাঁ রবাবীর ইতিবৃত্ত বর্ণন করব।

সাধক ও সঙ্গীতনায়ক বাসৎ খাঁ সাহেবের পবিত্র জীবনবৃত্তের

আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। তিনি অন্তিম জীবনে টিকারি মহারাজার সঙ্গীতগুরুরূপে গয়াধামে বাস করতেন। টিকারি মহারাজ তাঁকে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি তালুকরূপে দান করেছিলেন। বাসৎ খাঁর তিরোভাবের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলি মহম্মদ খাঁ সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। বাসৎ খাঁর অপর পুত্রদ্বয় মহম্মদ আলি খাঁ ও রেয়াসৎ আলি খাঁ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিতই বহুদিন বসবাস করেছিলেন।

আলি মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিয়া) বাসৎ খাঁর নিকট কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত সম্পূর্ণরূপেই অধিগত করেছিলেন। তিনি রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রবাদনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধ্যম পুত্র মহম্মদ আলি খাঁর কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল বলে বাসৎ খাঁ তাঁকে রবাবযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গীতাঙ্গর অধিক শিক্ষা ও সাধনা দিয়েছিলেন। কনিষ্ঠ রেয়াসৎ আলি খাঁ সঙ্গীত সাধনা অপেক্ষা জমিদারীতেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই ইহলীলা সংবরণ করেন।

আলি মহম্মদ খাঁ মোটেই বিষয়ী লোক ছিলেন না। প্রচুর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে তিনি তা রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি সর্বদা দরিদ্র শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন ; সম্পত্তির আয় তাদের বিতরণ করে দিতেন ; নিজেও বেশ বিলাসী ছিলেন, ভোগ ও দানে শীঘ্রই তাঁর সম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। অধিকাংশ তালুক বিক্রয় করে লক্ষাধিক টাকা তিনি কয়েক বৎসরে বিলাসে ও বিতরণে শেষ করে দিলেন। কিন্তু সেজন্য বড়কু মিয়াকে আপসোস করতে হয় নি। তিনি

জানতেন তাঁর অর্থের অভাব কখনও হবে না—কেননা, বিধাতা তাঁকে এত গুণ দিয়েছেন যে ভারতের যে কোনও নৃপতির দরবারে তাঁর অধিষ্ঠান বিশেষ গৌরবের বিষয় হবে—এমন রত্নকে পেলে যে কোন রাজা অর্থব্যয়ে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবেন না।

বড়কু মিয়ার অর্থ ও সম্মানের প্রাচুর্যের অভাব কখনও হয় নি। তিনি দরবারে যোগ দিতে চান, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র নেপালের তৎকালীন অধীশ্বর তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। নেপাল রাজদরবার বড়কু মিয়ার আবির্ভাবে সঙ্গীত সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

বড়কু মিয়া নেপালে সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করে-ছিলেন। বস্তুত তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নেপালরাজ্য উচ্চ সঙ্গীতের এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। নেপালের অধীশ্বর নিজেও সঙ্গীতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও অমাত্যগণও উচ্চসঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্য অকাতরে অর্থ বিতরণে কখনও কুণ্ঠিত হন নি। নেপালের স্থানীয় কথক ও গায়কগণও হিন্দুস্থানের বিশিষ্ট গুণীগণের আগমনে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। এখনও নেপালে উচ্চশ্রেণীর গায়কের অভাব নাই।

নেপাল দরবারে বড়কু মিয়ার সমসাময়িক সকল গুণীই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বড়কু মিয়ার এক স্বভাব ছিল, তিনি কখনও একলা কোথাও থাকতেন না, তাঁর চারি-পাশে বহু শিষ্য সর্বদাই থাকত। বিদ্যাদানেও তিনি যেরূপ

মুক্তহস্তে ছিলেন—অর্থদানেও তাঁর তেমনি বাদশাহী মেজাজ ছিল। বহু দরিদ্রের ভরণ পোষণ তিনি করেছেন। পাঁচজন ওস্তাদকে সঙ্গীত শিখানো ও তাদের নিয়ে আমোদ করা তাঁর প্রধান সখের জিনিস ছিল।

নেপালে তৎকালীন গুণীদের মধ্যে তাজ খাঁ ধ্রুপদী, রাম-সেবকজী খেয়ালী-সেতারী, নিয়ামতুল্লা খাঁ স্বরোদী ও মোরাদালী খাঁ স্বরোদী বড়কু মিয়ার পরেই বিশেষ সম্মানজনক পদে ছিলেন।

রামসেবকজী কলিকাতার বিখ্যাত গায়ক ও তালাধ্যায়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় সুপণ্ডিত পশুপতিজী ও শিবসেবকজী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা। রামসেবকজী একজন অসাধারণ গুণী ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ দরবারের বিখ্যাত মনোহর নামক গায়ক ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশজাত। সেই সময়ে খেয়ালে কোনও হিন্দু গায়কই তাঁর তুল্য ছিল না, বিশেষতঃ লয়ের সূক্ষ্ম কাজে এই বংশের তুলনা হয় না। রামসেবকজী বড়কু মিয়ার কাছে সেতারের শিক্ষা পেয়েছিলেন।

নিয়ামতুল্লা খাঁ স্বরোদায়ের কথা আমরা পূর্বেই লিখেছি। তিনি বাসৎ খাঁর শিষ্য ছিলেন। রবাব অঙ্গে স্বরোদের বাদ্য পদ্ধতির প্রবর্তনা তিনিই করেন। তাঁর ন্যায় দ্রুত হাত কোনও স্বরোদীরই ছিল না। গুণেও তাঁর সমকক্ষ গুণী খুব কমই ছিল। ভারত বিখ্যাত স্বরোদী কেরামতুল্লা খাঁ ও কৌকব খাঁ সাহেবগণ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র। ইঁহারা সকলেই রবাব অঙ্গে স্বরোদ বাজিয়েছেন।

মোরাদালি খাঁ স্বরোদীও কলিকাতায় অপরিচিত নন। মোরাদালি খাঁ সুমধুর স্বরোদবাদক জনপ্রিয় দরদী ওস্তাদ্ হাফেজ্ আলি খাঁর জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য। হাফেজ আলি খাঁর হাতের অসাধারণ মিষ্টত্ব তাঁর স্বোপার্জিত নহে—ইহা তাঁর বংশগত বিত্তস্বরূপ। মোরাদালি খাঁ স্বরোদে বীণার কায়দা এনেছিলেন। মোরাদালি খাঁর পিতা গোলাম আলি উৎকৃষ্ট গৎ তোড়া বাজাতেন। কিন্তু মোরাদালি স্বরোদে আলাপের ও বিশেষতঃ বিলম্বিত আলাপের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি গোলাম মহম্মদ* খাঁ সুরবাহারী ও উজীর খাঁ সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন ও এঁদের নিকটে বীণার অঙ্গের আলাপ ও বিশেষভাবে বিলম্বিত আলাপ শিক্ষা করে স্বরোদে তা প্রবর্তন করেন। কলিকাতার আত্মভোলা সরলপ্রাণ গুণী স্বরোদী মহম্মদ আমীর খাঁ ও তাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁ মোরাদালি খাঁর প্রধান শিষ্য। মহম্মদ আমীর খাঁ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

সৌরজগতে সূর্যের চতুর্দিকে যেমন গ্রহগণ পরিভ্রমণ করে, আলি মহম্মদ খাঁও সেইরূপ উল্লিখিত ওস্তাদগণ পরিবৃত ছিলেন। এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর বড়কু মিয়ার নিকট ঋণী। বড়কু মিয়া অধিকাংশ সময়ই সুরশৃঙ্গার যন্ত্র বাজাতেন। সঙ্গীত-বিদ্যা তাঁর নিকট সাধনার বস্তু ও প্রাণের আরামের বিষয় ছিল। বিদ্যায় প্রতিযোগিতা করা, কিংবা অপর গুণীদের বিদ্যায় পরাস্ত করা, এ সকল প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তিনি অতি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ও উদার ব্যবহারে, তাঁর

বিদ্যার প্রগাঢ়তায় ও অপূর্ব ক্রিয়াকৌশলে সকলেই আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট আসত। সুরশৃঙ্গারের আলাপে তাঁর ধৈর্য ছিল অসাধারণ। এক এক রাগ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলম্বিত ও মধ্যলয়ে বাজিয়েও তাঁর বাজনা যেন শেষ হতে চাইত না। তাঁর সৃষ্টিকৌশল এরূপ আশ্চর্য ছিল যে বহু ঘণ্টা কোন রাগ বাজালেও রাগের তানগুলির নবীনতার কখনও অভাব হত না।

আলি মহম্মদ খাঁ সাহেব শেষ জীবনে নেপাল রাজ্য ছেড়ে বারাণসীধামে বাস করেন এবং কাশীতেই তাঁর ইহলীলার অবসান হয়। তাঁর পিতৃব্য পুত্র সাদেক আলি খাঁ সাহেব ও তদীয় ভ্রাতা নিসারালি খাঁ কাশী নরেশের সঙ্গীতগুরু পদে বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এ কথা আমরা পূর্বে লিখেছি। তাঁদের লোকান্তর গমনের পর সেই পদে আলি মহম্মদ খাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। তিনিও বৃদ্ধদশায় সুদূর নেপালের শীতপ্রধান আবহাওয়ার চেয়ে কাশীবাসই পছন্দ করলেন ও কাশী রাজের গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হলেন।

বারাণসী ইতিপূর্বেই তানসেনের ঘরানা গুণীগণের প্রচারিত সঙ্গীত সম্ভারে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল—তবে বড়কু মিয়াও সেই সমৃদ্ধির অধিকতর বৃদ্ধিতে অনেক সহায়তা করেছেন। কাশীতেই বড়কু মিয়ার প্রধান শিষ্যগণ সমবেত হন। ঐ সময় বারাণসীর রাজদরবারে নিম্নলিখিত গুণীগণ সঙ্গীতসভায় স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে থাকতেন, যথা—

(১) গায়ক আলি বকস (ধামারী); ইনি বঙ্গদেশের বিখ্যাত

হোরি-ধ্রুপদ গায়ক অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গুরু। (২) পশ্চিমভারতীয় সেনী-ঘরানা-বিখ্যাত ধ্রুপদী দৌলত খাঁ; ইনি কলিকাতাতে শেষ জীবনে বিশেষ খ্যাতির সহিত অবস্থিত ছিলেন। (৩) ধ্রুপদী রসুল বকস; শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশীয় বঙ্গের রত্নস্বরূপ রামদাস গোস্বামী মহোদয়ের গুরু। (৪) গায়ক তসদ্দক হোসেন খাঁ।

ইঁহাদের মধ্যে বড়কু মিয়ার আবির্ভাবে বারাণসীর সঙ্গীত-ক্ষেত্র উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল। বড়কু মিয়া কাশীধামে অনেকদিন সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন ও সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার করে গিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যও অসংখ্য ছিল; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুণীগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়কু মিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন জালন্ধর নিবাসী সৈয়দ বংশীয় **মীর সাহেব**। মীর সাহেবের ন্যায় গুরুসেবা খুব অল্প শিষ্যের পক্ষেই সম্ভব। অতি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও মীর সাহেব ভৃত্যের ন্যায় বড়কু মিয়ার সেবা পরিচর্যা করতেন, ফলে বড়কু মিয়ার সকল শিক্ষাই তিনি অধিগত করতে পেরেছিলেন—সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের আলাপ ও ঘরানা-ধ্রুপদ সমস্তই বড়কু মিয়া তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বড়কু মিয়ার পুত্রসন্তান না হওয়ায় মীর সাহেবকেই তিনি পুত্রবৎ শিখিয়েছিলেন।

মীর সাহেবের পর অন্যান্য যন্ত্র-শিষ্যদের মধ্যে **নান্নে খাঁ** বীণকার ও পাটনার জমিদার সেতারী **প্যারে নবাব খাঁর** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বড়কু মিয়ার হিন্দু শিষ্যদের মধ্যে কাশীর বিখ্যাত বীণকার **মিঠাইলালের** নাম অনেকেই জানেন। তদ্ভিন্ন

সুরশৃঙ্গার বাদক **পান্নালালও** অনেকদিন আলি মহম্মদ খাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলেন।

আলি মহম্মদ খাঁর অপর প্রধান শিষ্য রাজা স্যার **শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর** মহোদয়। শৌরীন্দ্রমোহন বড়কু মিয়ার অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ঠাকুর মহোদয়ও গুরু বড়কু মিয়াকে অতীব শ্রদ্ধা করতেন। কাশীধামে ও কলিকাতায় রাজা বাহাদুর দীর্ঘকাল বড়কু মিয়ার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা ও তন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে যথার্থভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। সঙ্গীতের উন্নতি-কল্পে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় যা করেছেন তার তুলনা নেই। বড়কু মিয়ার 'নিকট তিনি যে বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর অমূল্য গ্রন্থনিচয়ে তার পরিচয় আছে। তাঁর রাগ রাগিণীর সকল পরিচয়ই তানসেনের বংশীয় বিদ্যার গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেতার অতি উৎকৃষ্ট বাজাতেন ও ধ্রুপদে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় যে বঙ্গীয় সঙ্গাতভারতীর জনকস্থানীয় ছিলেন ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

বড়কু মিয়ার অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কাশী ঘোষের পৌত্র, তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বাংলার সঙ্গীতের এক নিভৃতচারী মহা সাধক ছিলেন। তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় অতি নীরব প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু নীরবে তিনি বঙ্গদেশের সঙ্গীতের কতটা উন্নতি করেছেন তা এখনও সাধারণে জানে না। তাঁর জীবনী বিস্তৃতভাবে পরে প্রকাশ করব। ধ্রুপদী দৌলত খাঁ, সেতারী এমদাদ খাঁ সাহেব ও

খেয়ালী ক্ষাসে খাঁ তারাপ্রসাদ বাবুর বিডন স্ট্রীটস্থ ভবনে বসবাস করেই বাংলার সঙ্গীতের অশেষ উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়েছেন।

তারাপ্রসাদবাবু কৈশোর বয়সে রামদাস গোস্বামী মহাশয়েরর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা পান। স্বনামধন্য মধুরকণ্ঠ ও সুপণ্ডিত ধ্রুপদ গায়ক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তারাপ্রসাদবাবুরই সতীর্থ। তাঁহাদের উভয়ের শিক্ষা রামদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আরম্ভ হয়েছিল। পরে তারাপ্রসাদবাবু বড়কু মিয়ার শিষ্য হন। বড়কু মিয়া তারাপ্রসাদবাবুকে খুবই স্নেহ করতেন ও তাঁকে বহু ধ্রুপদ ও যন্ত্রালাপ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারাপ্রসাদ-বাবুকে তিনি যন্ত্রসঙ্গীত প্রত্যহই শোনাতেন—তাঁর কর্ণে সেই সঙ্গীতের স্বর্গীয় মূর্চ্ছনা সর্বদাই অনুরণিত হত। তারাপ্রসাদবাবুর নিকট বড়কু মিয়ার সুরশৃঙ্গার বাজনার বর্ণনা শুনে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারি নাই। সে আলাপে ধৈর্য কি অসামান্য ছিল—সুরের কি স্থায়ী রেশ! আর প্রতি স্বরঝঙ্কার যেন সুধারসে নিষিক্ত। তারাপ্রসাদবাবু তাই বড়কু মিয়ার নামে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলতেন, যে বড়কু মিয়ার বাজনা শোনার সৌভাগ্য যার হয়েছে, তার নিকট অন্য সকল সঙ্গীতই প্রাণহীন ও নীরস—সে সঙ্গীত যেন স্বর্গীয়, পৃথিবীর অন্য কোন সঙ্গীতই যেন তার পর প্রাণে কোনও তৃপ্তি দেয় না।

আলি মহম্মদ খাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কাশীধামে ইহলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তারাপ্রসাদ বাবু তাঁর নিকটে কাশীধামে ছিলেন। বড়কু মিয়ার কোনও পুত্রসন্তান ছিল না—কন্যা সন্তান ছিল। তাঁর দৌহিত্রেরা কাশী নরেশের আশ্রয়ে

বহুদিন প্রতিপালিত হন। আলি মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব রবাবী তাঁর স্থান অধিকার করেন।

রবাবী কাশিম আলি খাঁ সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গদেশে উচ্চ সঙ্গীতের এক বিরাট স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ধ্রুপদী শ্রেষ্ঠ হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সঙ্গীতে পরিবর্তন" নামক পুস্তকে কাশিম আলীর নাম একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। কাশিম আলী খাঁ সুপ্রসিদ্ধ রবাবী সাদেক আলী খাঁ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতা কাজাম আলী খাঁ সঙ্গীতনায়ক উজীর খাঁ সাহেবের মাতামহ। বাল্যকালে কাশিম আলি তাঁর পিতা ও পিতৃব্যের নিকট রবাব ও বীণা যন্ত্র উত্তমরূপে অধিগত করেছিলেন। কাশিম আলী যদিও রবাবী বংশজাত ছিলেন, তথাপি বীণা যন্ত্রে তাঁর অনুরাগ ও সাধনা পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রথম যৌবনে তাঁর অধ্যবসায় ও সাধনার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। ফলে বীণা ও রবাব এই উভয় যন্ত্রই তিনি সমভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। লোড়ী, লড়কুথাও ও মৃদঙ্গ সঙ্গতে বাজনায় তাঁর সমকক্ষ হিন্দুস্থানে বড় কেহ ছিল না।

প্রথম যৌবনে পিতার মৃত্যুর পর কাশিম আলী মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শার দরবারে বৃত্তিভোগী বীণাকার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময়ে সঙ্গীতনায়ক বাসৎ খাঁ সাহেব নবাব সাহেবের সঙ্গীতগুরু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশিম আলী তাঁর দাদামহাশয় বাসৎ খাঁর নিকট বহু রাগ রাগিণী ও ধ্রুপদ শিক্ষাপূর্বক সঙ্গীত বিদ্যা পূর্ণাঙ্গরূপে আয়ত্ত করেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় কাশিম আলীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর বহুবার কাশিম আলীকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণপূর্বক বীণা ও রবাব শুনেছেন। কলিকাতার প্রাচীন সঙ্গীতানুরাগী গুণীগণ আজও একবাক্যে বলেন যে, কাশিম আলীর ন্যায় তন্ত্রকার বঙ্গদেশে কদাপি আসে নাই।

মেটিয়াবুরুজের দরবার ভেঙ্গে যাওয়ার পর বাসৎ খাঁ সাহেব যখন গয়াধামে গেলেন, তখন কাশিম আলী ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন। তথায় ত্রিপুরার মহারাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যদুভট্ট তৎকালে ত্রিপুরারাজ্যে গায়করূপে কর্ম করতেন। যদুভট্টকে খাঁ সাহেব সেতার যন্ত্র শিক্ষা দেন, কিন্তু শ্রুতিধর ভট্ট মহাশয় কাশিম আলির রেয়াজের সময় নিকটবর্তী কোন গুপ্তস্থানে সঙ্গোপনে থেকে খাঁ সাহেবের রবাবের তালিমও অনেকখানি অধিগত করতে পেরেছিলেন। কাশিম আলি খাঁ পরে তা জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হন ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করে ভাওয়াল রাজ্যের মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাশিম আলির শেষ জীবন ভাওয়ালেই অতিবাহিত হয়।

কাশিম আলির বাজনা শোনা রাজা মহারাজাদের পক্ষেও সুলভ ছিল না। সঙ্গীতের প্রেরণা অন্তরে না পেলে তিনি কখনও বাজাতেন না, বলতেন যে তাঁর যন্ত্রের মেজাজ খারাপ হয়েছে, মেজাজ ভাল হলে বাজনা শোনাবেন। যখন সঙ্গীতের প্রবাহ নিজ অন্তরে অনুভব করতেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক

এক রাগ বাজালেও তাঁর সৃষ্টির উৎস নিঃশেষ হতো না। ভাওয়ালে একবার তিনি রাত্রি চারটা থেকে বেলা দশটা অবধি ভৈরব রাগের আলাপ রবাব যন্ত্রে বাজিয়েছিলেন। সে আসরে ঢাকার নবাব বংশীয় ও পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট অভিজাত বংশীয় ভূম্যধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলা বাদক প্রসন্ন বণিক্য মহাশয়ের নিকট কাশিম আলি খাঁর এইরূপ অনেক ঘটনা আমরা জানতে পারি। তিনি বলেন কাশিম আলি খাঁ মানুষ ছিলেন না, নরদেহধারী কোন গন্ধর্ব বা দেবতাবিশেষ ছিলেন, এত বড় গুণীকে এতদিন বঙ্গদেশে পাওয়া সে সময়ে বাঙ্গালার বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। কাশিম আলি খাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভাওয়ালে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁর সমাধি এখনও ভাওয়াল বক্ষে বিরাজিত রয়েছে ও তাঁর নিজ রেয়াজের রবাব যন্ত্র রাজপ্রাসাদে আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

মহম্মদ আলি খাঁ

আলি মহম্মদ খাঁ ও কাশিম আলি খাঁর পর রবাবীবংশে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবই শুধু বিদ্যমান থাকলেন। ইনি ভারতের শেষ রবাবী ও তানসেনের পুত্রবংশের শেষ রত্ন। আমরা ইতিপূর্বে ইঁহার নাম একাধিকবার উল্লেখ করেছি। ইনি বাসৎ খাঁ সাহেবের মধ্যম পুত্র ছিলেন। এঁর শিক্ষা পিতার নিকটই পরিসমাপ্ত হয়েছিল। বাসৎ খাঁ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আলি মহম্মদ খাঁকে 'সুরশৃঙ্গার' শিক্ষা দিয়েছিলেন ও মহম্মদ আলি খাঁকে

কণ্ঠসঙ্গীতে ধ্রুপদ ও আলাপ যন্ত্রে রবাবের তালিম দিয়েছিলেন। ত্রিশ বৎসরকাল শিক্ষার পর পিতার আর্থিক অভাব হলে, জ্যেষ্ঠ আলি মহম্মদ খাঁ নেপাল রাজ্যে গমন করেন কিন্তু মহম্মদ আলি পৈতৃক ভদ্রাসন গয়াধামেই বহুদিন বসবাস করেছিলেন। গয়ায় বিহারীলাল নামক জনৈক পাণ্ডা এবং প্রসিদ্ধ এস্রাজবাদক ধনী পাণ্ডা কানাইলাল ঢেঁড়িজা মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গয়ায় সাত আট বৎসর যাপনের পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব গিধৌর রাজ্যের সঙ্গীতগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমরা খাঁ সাহেবের নিকট শুনেছি যে তিনি একবার হরিহরছত্রের মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, ঐ সময় গিধৌরের দেওয়ান সাহেব রাজ্যের জন্য অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতি ক্রয়ার্থে তথায় যান। সেখানে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের রবাব শুনবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। খাঁ সাহেবের বাজনা শুনে, দেওয়ান সাহেব অতিশয় আহ্লাদিত হন ও গিধৌর রাজ্যে তাঁকে নিয়ে যান। মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের বয়স তখন পঞ্চান্ন বৎসর। ঐ সময় হতে মৃত্যুকাল অবধি সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর খাঁ সাহেবের সহিত গিধৌর রাজ-দরবারের সম্বন্ধ অক্ষুন্ন ছিল। মাঝে মাঝে নানা সময় অন্যান্য রাজদরবারে কালযাপন করলেও খাঁ সাহেব অধিকাংশ সময়ই গিধৌরেই অবস্থান করেছেন।

মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব অন্যান্য সঙ্গীত-কলাবিদদিগের ন্যায় অর্থ ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তিনি অর্থের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কোথাও যেতেন না—কেহ

আগ্রহসহকারে নিমন্ত্রণ করলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। গিধৌর দরবারে তাঁকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করায় তিনি অন্য দরবারের সন্ধান কখনও করেন নাই। তবে অন্যান্য ভূপতিরা অনেকবার সঙ্গীতগুরুরূপে তাঁদের রাজসভায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে দীর্ঘদিনের জন্যেও তাঁকে রাখতে পেরেছেন।

এইভাবে কাশীধামে আলি মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব কাশীরাজের আহ্বানে তথায় কয়েক বৎসর কাল অবস্থান করেন। সে সময় স্বরোদী মজরু খাঁ ও গায়ক তসদ্দুক হোসেন খাঁ কাশীদরবারের প্রধান গুণীদের অন্তর্গত ছিলেন। বারাণসীতে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব রবাবযন্ত্রে ও কণ্ঠসঙ্গীতে শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন। আমরা শুনেছি একবার দারুণ গ্রীষ্মের সময় সঙ্গীতসভায় কাশীরাজ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবকে রবাব যন্ত্রে 'বৃন্দাবনী সারং' বাজাতে অনুরোধ করেন। খাঁ সাহেবের বাজনার পর কাশীরাজ এতই তৃপ্ত হন, যে সে সভায় অন্য সকল গুণীগণের গানবাজনা বন্ধ করে দেন—তিনি তখন বলেছিলেন যে মহম্মদ আলির "সারং" শুনে তাঁর দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়ে গেছে এর পর অন্য গান বাজনা আর কি প্রয়োজন?

কাশীধামে কয়েক বৎসর যাপন করে মহম্মদ আলি পুনরায় গিধৌরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময় ভারত বিখ্যাত কলাবিদ নবাব হায়দর আলি খাঁ সাহেব রামপুরের নিকটবর্তী তাঁর "বিল্‌সি" এষ্টেটে তাঁর অসামান্য প্রতিভাশালী পুত্র সাদৎ আলি খাঁ সাহেবকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর নিজ অধিগত

সকল বিদ্যা পুত্রকে শিক্ষা দিবার পর তিনি মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে তথায় নিয়ে যান। নিজের অজ্ঞাত বিদ্যা মহম্মদ আলির নিকট লাভ করা তাঁর এক উদ্দেশ্য ছিল ও অপর উদ্দেশ্য ছিল নিজ পুত্রকে তানসেনের পুত্রবংশীয় সঙ্গীত গুরুর নিকট দীক্ষিত করা। এই উভয় উদ্দেশ্যে মহম্মদ আলিকে তিনি ডেকেছিলেন। মহম্মদ আলি খাঁ নবাব সাহেবের আতিথ্যে ছয়মাসকাল বিল্‌সি এষ্টেটে ছিলেন ও সাদৎ আলি খাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন। মহম্মদ আলির আশীর্বাদে নবাবজাদা সাদৎ আলি খাঁ সাহেব সত্যই ভারতের এক অদ্বিতীয় কলাবিদ ও তন্ত্রকাররূপে অচিরেই উজ্জ্বল কীর্তিলাভ করেন। সাদৎ আলি খাঁর অপর নাম ছিল ছম্মন সাহেব। নবাব ছম্মন সাহেবের নাম হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি সুবিখ্যাত। ছম্মন সাহেব মহম্মদ আলির শিষ্যদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন সন্দেহ নাই।

নবাব ছম্মন সাহেবের শিক্ষা-সমাধার পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব গিধৌরে ফিরে এসে প্রায় কুড়ি বৎসর আর কোথাও বার হন নি। ইতিমধ্যে রামপুরের গত নবাব হামিদ আলি খাঁ বাহাদুর আপন পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রামপুরের সঙ্গীত-গৌরব বিশেষ বর্ধিত করছিলেন। উজীর খাঁ সাহেব তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন এবং নবাব সাহেব তাঁর পিতৃব্যপুত্র ছম্মন সাহেবকে Home Secretary-র পদ দিয়ে রামপুরের সঙ্গীত-সভাকে হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব হামিদ আলি খাঁ বাহাদুর দেখলেন যে মহম্মদ আলি খাঁ

সাহেবের অভাবে রামপুর দরবার অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাই তিনি মহম্মদ আলিকে আমন্ত্রণ করবার ভার ছম্মন সাহেবকে দিলেন। ছম্মন সাহেব মহম্মদ আলির প্রিয় শিষ্য ছিলেন —তাঁর আকুল আগ্রহের টানে মহম্মদ আলি গিধৌর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি নিয়ে রামপুরে না গিয়ে পারলেন না।

রামপুরের গত নবাব হামিদ আলি এই সময় মহম্মদ আলির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁকে সাতিশয় সমৃদ্ধির মধ্যেও পরম যত্নে ছয় সাত বৎসরকাল প্রতিপালন করেছিলেন। তখন খাঁ সাহেবের বয়স অশাতিবর্ষ অতিক্রম করলেও তাঁর শরীর ও মন অপটু ছিল না। রামপুর নবাবের নিকট খাঁ সাহেব রীতিমত রবাব বাজিয়েছেন ও নবাব বাহাত্বরকে সঙ্গীত শিক্ষাদান করেছেন। উজীর খাঁ সাহেব মহম্মদ আলির সম্পর্কে দৌহিত্র ছিলেন ও পরস্পর তাঁদের খুবই রসিকতা চলত। উজীর খাঁর বীণা বাদনের ভূয়সী প্রশংসা মহম্মদ আলি সর্বদাই করতেন এবং উজীর খাঁও মাতামহ জ্ঞানে এবং রবাবী বংশের শেষ রত্নরূপে তাঁর সম্মান করতেন।

কয়েক বৎসরকাল দরবারে যাপন করবার পর মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব রামপুর নবাবের দরবার অপেক্ষা নিজ প্রিয় শিশু ছম্মন সাহেবের গৃহে অবস্থানই অধিক আরামপ্রদ মনে করে বিল্‌সিতে গমন করেন। বিল্‌সিতে বৎসর তুই যাপন করবার পর বিধাতার কঠোর বিধানে খাঁ সাহেব প্রিয় ছম্মন সাহেবকে হারালেন। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে ছম্মন সাহেবের পরলোক

গমনে ভারতীয় সঙ্গীতের যে কত বড় ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও ভারতের অধিকাংশ লোক জানেন না।

শিষ্য হলেও ছম্মন সাহেব যথার্থই মহম্মদ আলির পুত্রস্থানীয় ছিলেন। মহম্মদ আলির ঔরসজাত পুত্র না থাকায় তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর পোষ্যপুত্র সঙ্গীত বিভাগে না থাকায় ছম্মন সাহেবই পুত্রের শিক্ষা লাভ করেন। এরূপ রত্নস্বরূপ শিষ্যকে অকালে হারিয়ে মহম্মদ আলি কি দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। ছম্মন সাহেবের মৃত্যুর পর শোকাতুর মহম্মদ আলি লক্ষ্ণৌ নগরে সঙ্গীত কলেজ প্রতিষ্ঠাতা রাজা সাহেব নবাব আলির আতিথ্যে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। ঐ সময় মহম্মদ আলির নিকট নবাব আলি খাঁ শতাধিক ধ্রুপদ শিক্ষা ক'রে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "মআরিফুন্নগমাৎ" এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকে খাঁ সাহেবের একটি ফটোও ছাপানো হয়েছে। "ম আরি ফুন্ন গমাৎ" এর প্রথম খণ্ডটি শ্রীযুক্ত ভাতখণ্ডেজীর "লক্ষ্যসঙ্গীতে'র অনুসরণে লিখিত। পণ্ডিত প্রবর ভাতখণ্ডেজীও মহম্মদ আলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছেন। রাজা নবাব আলি ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বর্তমানযুগে সঙ্গীতের প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। লক্ষ্ণৌ ম্যারিস্ সঙ্গীত কলেজ তাঁদেরই বহুবর্ষব্যাপী তপস্যার সুবর্ণ ফল। এঁরা দু'জনেই ছম্মন সাহেবের সহকর্মী ছিলেন। ছম্মন সাহেব ছিলেন এঁদের যজ্ঞের পুরোহিত স্বরূপ। ছম্মন সাহেবের অকাল তিরোধানে লক্ষ্ণৌ কলেজেরও দারুণ ক্ষতি হয়েছিল—বিশেষতঃ ছম্মন সাহেব

আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত ও তন্ত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন যা অপ্রকাশিত রয়ে গেল। এই ক্ষতিপূরণের জন্যই রাজা নবাব আলি সাহেব মহম্মদ আলিকে ছয় মাস স্বভবনে রেখে ধ্রুপদগুলির উদ্ধারের চেষ্টা করেন ও শতাধিক ধ্রুপদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর এ চেষ্টার মূল্য কালে একদিন গুণীসমাজ নিশ্চয়ই বুঝবেন।

রামপুর ও লক্ষ্ণৌ থেকে মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব পুনরায় গিধৌরে ফিরে এসে অন্তিম কয়েক বৎসর গিধৌর দরবারে অবস্থান করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে গিধৌরেই তাঁর দেহান্ত হয়। গিধৌরে শেষ কয়েক বৎসর থাকা কালে আমার পিতৃদেব পূজ্যপাদ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নিমন্ত্রণে খাঁ সাহেব মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ গৌরীপুরে আগমন করতেন। এইভাবে খাঁ সাহেবের ধ্রুপদ সঙ্গীত ও রবাব-সুরশৃঙ্গার যন্ত্র শুনবার ও শিক্ষার সুযোগ লেখকের হয়েছিল।

খাঁ সাহেবের সঙ্গীত শোনারপর আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, যথার্থ ধ্রুপদ গান ও আলাপ কি বস্তু ও তা কতই সুমিষ্ট হতে পারে। জীবনাবসানের পূর্বে তিনি তাঁর শেষ আশীর্বাদের সঙ্গে এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে সঙ্গীতের সার হচ্ছে ধ্রুপদ। ধ্রুপদ শিখলেই রাগ-রাগিণীর মর্মদ্বার উদ্ঘাটিত হয়—অন্য সকলই তখন সরল হয়ে আসে।

খাঁ সাহেবের শেষ কতিপয় বৎসরই আমরা তাঁর কাছ থেকে আলাপ ও ধ্রুপদ শিক্ষা করেছি। খাঁ সাহেব তাঁর অন্তিম সময় পর্যন্ত কখনও জরা বা ব্যাধিতে অবশ হন নি। মৃত্যুর এক

বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অক্লেশে দুই তিন মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করতে পারতেন এবং মৎস্য শীকারে তাঁর বড় সখ ছিল। খাঁ সাহেবের শরীর খুবই বলিষ্ঠ ছিল ও কুস্তিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাই নব্বই বৎসর বয়সেও তাঁর প্রাণশক্তির কিছু অভাব দেখা যেত না। দৈবের বিড়ম্বনায় ক্যানসার রোগ তাঁকে ধরল—নচেৎ আমাদের বিশ্বাস ছিল যে তাঁর পরমায়ু শত বৎসর অতিক্রম করবে।

মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ যে কি নিবিড় ও প্রগাঢ় ছিল, তা পুস্তকে প্রকাশের নয়। তাঁকে আমরা যথার্থই পিতার ন্যায় ভক্তি করতাম এবং তিনিও যখনই আমাদের ছেড়ে গিধৌরে যেতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। আজ তাঁর আত্মার অনন্ত শান্তিই ঈশ্বরের নিকট সর্বান্তঃকরণে আমরা প্রার্থনা করি।

উজীর খাঁ

এক্ষণে আমরা এ যুগের সঙ্গীতনায়ক বীণকার ঘরের শ্রেষ্ঠ রত্ন উজীর খাঁ সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করব। মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব ও উজীর খাঁ সাহেব—ইহারাই এ যুগে ভারতের সঙ্গীতাকাশের চন্দ্র ও সূর্য ছিলেন, সন্দেহ নাই। উভয়েই একই বৃক্ষের দুই শাখার দু'টি সুবর্ণ ফল। একজন তানসেনের পুত্র-ঘরের ও অপরজন কন্যা-ঘরের—দু'জন দু'ঘরের রত্ন। একই সময়ে এঁরা হিন্দুস্থানে সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার করেছেন। সম্পর্কে এঁরা মাতামহ ও দৌহিত্র। প্রায় একই

স্থানে এঁদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত ধ্বনিত ও অনুরণিত হয়েছে এবং প্রায় একই সময়ে এঁরা দু'জনে ধরাধাম ত্যাগ ক'রে হিন্দুস্থানের সঙ্গীতের শেষ সম্পদ সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকে নিয়ে গেছেন।

সঙ্গীতনায়ক উজীর খাঁর জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় তাঁর পিতা আমীর খাঁ বীণকার রামপুরে নবাব কাম্বে আলি খাঁর দরবারে ছিলেন। বিখ্যাত সুরশৃঙ্গার বাদক বাহাদুর সেন খাঁও সেখানেই অবস্থিত ছিলেন। অতি বাল্য বয়সেই উজীর খাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রবাদনে বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। সাত আট বৎসর বয়স হতেই তিনি পিতার নিকট ধ্রুপদ ও বীণা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর মাতামহ বাহাদুর সেন নিঃসন্তান ছিলেন। বাহাদুর সেনও তাই অপত্য-নির্বিশেষে উজীর খাঁকে ধ্রুপদ ও রবাব শিক্ষা দান আরম্ভ করেন। ফলে কৈশোরকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই খাঁ সাহেব বীণা সুরশৃঙ্গার, রবাব ও ধ্রুপদে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। উজীর খাঁর শিক্ষা বিষয়ে বাহাদুর সেন ও আমীর খাঁর মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগীতা ছিল। উভয়েরই বাসনা ছিল যে উজীর খাঁর দ্বারা তাঁদের কীর্তি ও সুনাম বজায় থাকবে। যাঁর শিক্ষা সমধিক প্রকাশিত হবে তাঁরই নাম অধিক কীর্তিত হবে। তাই উভয়েই যত ভাল করে পারেন তাঁকে শিক্ষাদানের ত্রুটি করেন নি। উজীর খাঁর তা'তে দ্বিগুণ লাভ হ'ল। তিনি যন্ত্রের মিষ্টতায় বাহাদুর সেনের অতুলনীয় হাত পেলেন, আবার কণ্ঠে তাঁর পিতার বীণাবিনিন্দিত স্বর পেলেন। গীত ও তন্ত্র উভয় বিদ্যাতেই উজীর খাঁর প্রতিভার তুলনা রইল না।

কিশোর বয়সে বীণা, রবাব ও ধ্রুপদের শিক্ষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হবার পর উজীর খাঁ মাতামহ ও পিতা উভয়কেই হারালেন। নবাব কাম্বে আলি খাঁর জীবিতাবস্থায় খাঁ সাহেব তারই দরবারে প্রতিপালিত হ'লেন। কাম্বে আলি খাঁর দেহান্তের পরে তাঁর ভ্রাতা হায়দর আলি খাঁ উজীর খাঁকে বিল্‌সিতে নিয়ে গেলেন। হায়দর আলি খাঁর কথা পুর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তানসেনের পুত্রবংশের তদানীন্তন প্রায় সকল গুণীগণের নিকটেই শিক্ষালাভ করে-ছিলেন; অপরদিকে তিনি বীণকার আমীর খাঁরও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। আমীর খাঁ মৃত্যুকালে হায়দর আলী খাঁর উপর পুত্র উজীর খাঁর সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। হায়দর আলীও গুরুর দেওয়া এ দায়িত্বভার সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। যতদিন নবাব কাম্বে আলি খাঁ জীবিত ছিলেন ততদিন রামপুরেই হায়দর আলি খাঁ সাহেব উজীর খাঁর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। কাম্বে আলি খাঁর পরলোক গমনের পর উজীর খাঁকে তিনি নিজ জমিদারী বিল্‌সিতে নিয়ে গেলেন ও নিজ ভবনে রাখলেন। হায়দর আলি খাঁ সাহেব উজীর খাঁকে গুরুপুত্র জ্ঞানে যথার্থ সম্মান সমাদর ও যত্নের সহিত ছয় বৎসর কাল রেখেছিলেন। ঐ সময় নবাব হায়দর আলি খাঁ সাহেবের অতি ঘনিষ্ঠ নবাববংশীয়া কোনও আত্মীয়ার সহিত উজীর খাঁ সাহেবের বিবাহ হয়। হায়দর আলি খাঁই এই বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। বিবাহের পর খাঁ সাহেব নবাব সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক দেশভ্রমণে বাহির হলেন। খাঁ

সাহেবের বয়স তখন ২৬ বৎসর। বিদ্যায় ও অভ্যাসে তখন খাঁ সাহেব অতুলনীয়; তাই দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হওয়া তাঁর অস্বাভাবিক ছিল না।

খাঁ সাহেব রামপুরে ও বিল্‌সিতে অবস্থানকালে শুধু সঙ্গীত অভ্যাসেই নিশ্চিন্ত থাকতেন না; উপযুক্ত পণ্ডিতের নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হিন্দী, আরবী, পার্শি ও কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করেছিলেন। খাঁ সাহেবের বিদ্যা সর্বতোমুখী ছিল। পুরাণ অবলম্বনে নাটক ও কবিতাদি হিন্দী ভাষায় রচনা করা তাঁর অবসর বিনোদনের প্রধান অবলম্বন ছিল। তদ্ভিন্ন চিত্রাঙ্কণেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

খাঁ সাহেবের অপর মাতামহদ্বয় সাদেক আলি খাঁ ও নিসারালি খাঁ রবাবী ঐ সময় বারাণসীধামে কাশীরাজের দরবারে ছিলেন। উজীর খাঁ রামপুর ত্যাগ ক'রে সর্বপ্রথম কাশীধামে গমন করেন ও তাঁদের নিকট কিছুকাল অবস্থান করেন। সাদেক আলি খাঁর মৃত্যুর পর নিসারালি খাঁ কাশীতে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। নিসারালি খাঁ রবাবীবংশীয় সকল গুপ্তবিদ্যা এবং বাহাদুর সেনেরও অজ্ঞাত অনেক ধ্রুপদ উজীর খাঁ সাহেবকে দান করেন। নিসারালির মৃত্যুর পর উজীর খাঁ কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আগমন করেন ও কলিকাতাতেই বসবাস আরম্ভ করেন। কলিকাতায় তখন চাঁদনিতে মুন্সীজী নামক জনৈক ধনাঢ্য মুসলমানের আতিথ্যে অধিকাংশ সময় থাকতেন ও মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হতেন। কাশীতে পরে যখন আলি মহম্মদ খাঁ সাহেব রাজগুরু হন তখন উজীর খাঁ তাঁর

কাছেও মাঝে মাঝে যেতেন। আলি মহম্মদ খাঁও উপযুক্ত দৌহিত্রজ্ঞানে উজীর খাঁর বিশেষ সমাদর করতেন। তদ্ভিন্ন খাঁ সাহেব মাতুল কাশিম আলি খাঁর নিমন্ত্রণে ত্রিপুরা রাজদরবারেও বিশেষ সম্মান লাভ করেছিলেন।

কলিকাতায় খাঁ সাহেব প্রায় সাত আট বৎসর কাল ছিলেন কিন্তু প্রতি বৎসরই দেশভ্রমণে কয়েক মাস কাটানো তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। দ্বারভাঙ্গা রাজদরবার, ইন্দোর দরবার, হায়দরাবাদের নিজাম-দরবার ও মাদ্রাজ নগরীতেও নিমন্ত্রিত হয়ে খাঁ সাহেব অসামান্য গুণপণা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কলিকাতায় মেটিয়াবুরুজের নবাবগণ, দেশপূজ্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়, রাজা ছুনী শীল, জমিদার তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, পঞ্চেৎগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্র বাবু প্রভৃতি গুণীগণ খাঁ সাহেবের বিশেষ অনুরাগী ও ভক্ত ছিলেন। কলিকাতা থাকা কালে উজীর খাঁ বাংলাভাষা ভালরূপে শিক্ষা করেন ও বাংলা কথা তিনি অতি উত্তমরূপেই উচ্চারণ করতে পারতেন।

খাঁ সাহেব বীণাযন্ত্র অপেক্ষা সুরশৃঙ্গার যন্ত্রই অধিক বাজাতেন। যে সকল বাঙ্গালী বৃদ্ধ সঙ্গীতানুরাগীগণ তাঁর বাজনা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁদের কর্ণে আজও খাঁ সাহেবের সুরশৃঙ্গারের অপূর্ব ঝঙ্কারের রেশ যেন লেগে রয়েছে। গোবরডাঙ্গার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে তিনি যে চাঁদনিকেদারার আলাপ বাজিয়েছিলেন, তা শুনবার সুযোগ অনেকেরই হয়েছিল। আজও সে দিনের বাজনার ভূয়সী স্তুতি তাঁদের মুখে শুনতে পাই। খাঁ সাহেব বিশেষ অভিজাত ও

রাজা মহারাজা ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে বাজাতেন না; তবে সঙ্গীতানুরাগী গুণীগণ তাঁর নিজ গৃহে এলে আগ্রহের সহিত বাজনা শোনাতেন। কলিকাতায় তাঁর শিষ্যও অনেক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জমিদার তারাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ও রুদ্র-বীণাবাদক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা মহানগরীতে কয়েক বৎসর যাপনের পর উজীর খাঁ সাহেব রামপুরের স্বর্গীয় নবাব হামিদ আলি খাঁর সঙ্গীত-গুরুপদে অভিষিক্ত হ'য়ে তথায় গমন করেন। কলিকাতা অবস্থানকালেই খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির খাঁ (প্যারে মিয়ার) সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয়। রামপুরে বালক প্যারে মিয়াকে নিয়ে খাঁ সাহেব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। নবাব বাহাদুরের খুল্লতাত হায়দর আলি খাঁ উজীর খাঁর নবপদে প্রতিষ্ঠার মূল ছিলেন। তিনিই নবাব বাহাদুরের সঙ্গীতে উৎসাহ ও রুচি আনয়ন করেন। নবাব সাহেবও উজীর খাঁর মত অদ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু লাভ ক'রে সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

প্রথমতঃ নবাব হামিদ আলি বীণাযন্ত্র শিক্ষা করেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে অধিক আগ্রহ থাকায় হোরি-ধ্রুপদই সমধিক অভ্যাস করেছিলেন ও বহুদিনের সাধনাভ্যাসে কালে হোরি-ধ্রুপদের একজন অতুলনীয় গায়করূপে পরিণত হন। খাঁ সাহেবও নবাবের নিকট তাঁর বংশগত বিদ্যার কিছুই গোপন করেন নি এবং কাশ্মীর ও অন্যান্য রাজ্যের রাজন্যবৃন্দের নিকট

হ'তে অতি লোভনীয় পদের আহ্বান লাভ করলেও প্রিয় শিষ্য রামপুর নবাবকে কখনও পরিত্যাগ ক'রে অন্য রাজ্যে গমন করেন নি।

খাঁ সাহেব সর্বদাই রামপুর নবাবের সঙ্গে অবস্থান করতেন। রামপুরে খাঁ সাহেবের নামে নবাব বিস্তর জমিদারী লিখে দিয়েছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রাসাদতুল্য ভবনে প্রচুর দাসদাসী, সিপাহী, অশ্বযান ও মোটর খাঁ সাহেবের সেবার জন্য রেখেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতে প্রাচীন শিল্পকলার সম্মান রামপুরের নবাবের তুল্য আব কোনও নৃপতি করেছেন কিনা সন্দেহ। আর সঙ্গীত-বিদ্যা ও সঙ্গীত গুরুর প্রতি ভক্তির নিদর্শন তিনি যা দেখিয়েছেন তার তুলনা একালে মিলে না।

নবাব সাহেব খাঁ সাহেবসহ মুসৌরী, দিল্লী ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরে মাঝে মাঝে ভ্রমণে বাহির হ'তেন কিন্তু রামপুরে যাবার পর কলিকাতায় আসার সুযোগ আর খাঁ সাহেবের ঘটে ওঠে নি।

রামপুরে উজীর খাঁ সঙ্গীতের নানা বিভাগে বহু শিষ্য তৈয়ারী করেছিলেন। নবাব দরবারে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান অমাত্য ও নবাব পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে রামপুরের সঙ্গীত গৌরব যথেষ্ট প্রসারিত করেছিলেন। উজীর খাঁর অন্য শিষ্যদের মধ্যে পঞ্চেৎগড়ের জমিদার যাদবেন্দ্র বাবু, সেতার ও সুরবাহার বাদক নসির আলি, বীণকার মহম্মদ হোসেন, সেতারী আবদর রহিম ও হার্মোনিয়ম বাদক সৈয়দ ইব্বন আলি মিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহারা সকলেই খাঁ সাহেবের যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের শিষ্য। তবে খাঁ সাহেবের বৃদ্ধ বয়সে স্বরোদী হাফেজ আলি খাঁও বীণা-পাণির বরপুত্র বঙ্গ-গৌরব আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর খ্যাতি ও কীর্তি যথেষ্ট প্রবর্দ্ধিত করেছেন।

উজীর খাঁ সাহেবের পুত্র সন্তান তিনজন—নাজির খাঁ (বা প্যারে মিয়া) নাসির খাঁ ও সগীর খাঁ। ইহারা সকলেই পিতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্যারে মিয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা, প্যারে মিয়া পিতার নিকট বহুবৎসর সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন ও তাঁর প্রতিভা পিতারই তুল্য ছিল। প্যারে মিয়া বীণাযন্ত্রের সকল শিক্ষা আয়ত্ত করলেও কণ্ঠ সঙ্গীতেই অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই উজীর খাঁ তাঁকে কণ্ঠ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে গঠিত করে-ছিলেন। প্যারে মিয়ার সঙ্গীতে মেধা এত ছিল যে, পিতার অধিকাংশ শিষ্যের শিক্ষা তিনিই দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে উজীর খাঁ সাহেবের সকল শিষ্যেরই শিক্ষাভার তিনি নিয়েছিলেন। পরিশেষে ইন্দোর রাজদরবারের সঙ্গীত-বিভাগে তাঁর অতি সম্মানিত পদ স্থির হয়। কিন্তু বিধির কঠোর বিধানে প্যারে মিয়া ইন্দোরে যাবার পূর্বে আকস্মিক কলেরা ব্যাধির আক্রমণে কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'লেন। বৃদ্ধবয়সে জীবনের সকল আশা ও ভরসার স্থল প্রতিভাশালী পুত্রকে হারিয়ে উজীর খাঁ যে কতখানি আঘাত পেয়েছিলেন তাহা কল্পনাতীত।

প্যারে মিয়ার তিরোধানের পর ভগ্নহৃদয় উজীর খাঁ সাহেব আর বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই। সে দুর্ঘটনার দুই-তিন

বৎসরের মধ্যেই খাঁ সাহেব সঙ্গীতজগৎ অন্ধকার করে মহাপ্রস্থান করেন। খাঁ সাহেবের দেহ যেরূপ সুদৃঢ় ছিল, তাতে আরো কুড়ি বৎসরকাল তিনি স্বচ্ছন্দে সুস্থদেহে থাকতে পারতেন। কিন্তু অসহ্য পুত্রশোকেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও কালব্যাধির আক্রমণ হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে খাঁ সাহেব ইহলীলা সম্বরণ করেন।

জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পর যে কয়েক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর বংশগত অমূল্য সঙ্গীত সম্পদ আপন বংশে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হয়। তিনি দেখলেন যে তাঁর পৌত্র দবীর খাঁ ও কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত অধিকারী। এঁদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ক'রে যাওয়াই তখন তাঁর জীবনের কাজ হ'ল। ঈশ্বরকৃপায় তাঁর সে চেষ্টা যথার্থই সফল হ'ল। দবীর খাঁ বীণাযন্ত্রে অতি অল্পকাল মধ্যেই উজীর খাঁ সাহেবের সমুদয় বিদ্যাই আয়ত্ত করে নিলেন, সগীর খাঁও কণ্ঠসঙ্গীতে খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও অতুলনীয় স্বর-মাধুর্যের প্রতিরূপ দেখাতে লাগলেন। বিধির বিধানে ইহারাই খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও স্বরলালিত্যের অধিকারী হলেন—এঁদের দ্বারা খাঁ সাহেবের বংশ উজ্জ্বল রইল।

শিষ্যদের মধ্যে খাঁ সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আলা-উদ্দিন খাঁ। আলাউদ্দিনের তুল্য তপস্বী বর্তমান যুগে নাই। ইনি প্রাচীন মুনি বালকগণের মত সর্বস্ব ত্যাগ করে অতি কঠোর তপস্যায় সঙ্গীতসাধনা ক'রে গেছেন বৎসরের পর বৎসর। খাঁ সাহেবের প্রতি ইঁহার ভক্তি বর্তমান সময়ে গুরুভক্তির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উজীর খাঁ সাহেবও তাই আলাউদ্দিনকে পরম স্নেহের

সহিত স্বরোদ যন্ত্র, রবাব ও সুরশৃঙ্গারের বাদ্যপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেলেন—বহু গানও শেখালেন যা কোনও শিষ্য কখনও পান নি।

তাই খাঁ সাহেবের তিরোধানের রর একদিকে দবীর খাঁ সাহেব বীণাযন্ত্রে তাঁরই অপূর্ব ঝঙ্কারের রেশ আনতে পেরেছেন। সগীর খাঁ তাঁরই কণ্ঠের মিষ্টতা ও ধ্রুপদ হোরির অনুকরণীয় পদ্ধতির ছবি দেখাতে পেরেছেন; আর শিষ্যদের মধ্যে আলা-উদ্দীন সঙ্গীতগুরুর কীর্তিস্বরূপ সারা ভারতে সঙ্গীত বিতরণ করেছেন। পরে তিনি ইউরোপ খণ্ডে গমন করে তাঁর অসামান্য প্রতিভাদ্বারা সেখানকার বিদ্বন্মণ্ডলীকে মোহিত করেছেন। তাঁর অসামান্য সঙ্গীতজ্ঞানের প্রশংসায় ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ মুখরিত হয়ে উঠেছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি ওদেশের লোকের এখন শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে। ইঁহাদের দ্বারাই খাঁ সাহেব আজও অমর হয়ে আছেন। উজীর খাঁ সাহেব সারা ভারতের সঙ্গীত সৃষ্টির পিছনে রয়েছেন। তাঁর প্রেরণা আমরা পাচ্ছি হিন্দুস্থানের দিকে দিকে। যেখানেই উচ্চাঙ্গ ও মধুর সঙ্গীত শুনতে পাই সেখানেই খাঁ সাহেবের প্রভাব জাজ্বল্যমান দেখতে পাওয়া যায়। খাঁ সাহেব জীবিতকালে যেরূপ অদ্বিতীয় সঙ্গীত-গুরুরূপে পূজা পেয়েছেন, মৃত্যুতেও সেই পূজার বেদীতে তাঁর স্থান চিরদিনের জন্য আছে।

উজীর খাঁ সাহেবের মৃত্যুর কিছুকাল পর রামপুরের বরেণ্য নবাব হামিদ আলিও দেহত্যাগ করলেন। খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র খলিফা সগীর খাঁ সাহেব অতঃপর রামপুর ছেড়ে কলিকাতা

মহানগরীতে আগমন করেন। স্বর্গীয় রাজা স্যার সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের পৌত্র সঙ্গীতসাধক কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং আমাকে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

বর্তমান শতাব্দীতে যাঁরা মিয়া তানসেনের প্রতিভার বংশগত উত্তরাধিকার পেয়ে সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশে কলাবিদ্যা ও কলা-সুষমার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাঁদের দু'জনের অর্থাৎ বীণা-বিশারদ স্বর্গীয় উজীর খাঁ ও রবাবী মহম্মদ আলি খাঁর জীবন বৃত্তান্ত আমরা বিশদরূপে লিখেছি। বর্তমান কালে সেনী সঙ্গীতের যা কিছু জীবন্ত নিদর্শন তা তাঁদেরই সৃষ্টি। সুখের বিষয় এই যে তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেনী সঙ্গীত ভারত হ'তে অন্তর্হিত হয় নাই। মহম্মদ আলির পোষ্যপুত্রের ঘরের পৌত্র সোকৎ আলি খাঁ বয়সে বালক হলেও বিশেষ মেধার সহিত রবাবী বংশের অবশিষ্ট সকল গীতিই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও লক্ষ্ণৌ ম্যারিস্ কলেজে বর্ত-মান স্বরলিপি পদ্ধতি ও রাগের ঠাট ও গঠন শিক্ষা পেয়ে বর্তমান কালের উপযোগীরূপে সেনী সঙ্গীত প্রচার করছেন। রবাব সুর-শৃঙ্গারের বাদ্যরীতিও তাঁর করায়ত্ত। সুতরাং রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের বিকাশ মহম্মদ আলির সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয় নাই। তাঁকে নিয়ে Calcutta Musical Association নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল। নাটোরাধিপতি সুগায়ক, সুবাদক এবং উচ্চমার্গ সঙ্গীতের প্রধান পথপ্রদর্শক মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর উক্ত Association এর স্থায়ী সভাপতির পদ

অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, সকল গুণী-গণের সম্মিলন ও যথার্থ সেনী সঙ্গীতের সংরক্ষণ ও নূতন বিকাশ সাধন। এই Association সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

'সঙ্গীত সঙ্ঘের' সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 'সঙ্গীত সম্মিলনীর' প্রধান শিক্ষক গুণীবর গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়েই সেনী সঙ্গীতে শিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা সেনী সঙ্গীতের বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে নিজ নিজ গুণপণা প্রদর্শন ও বঙ্গদেশে উচ্চ ও সুকুমার সঙ্গীতকলার বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। স্বর্গীয় উজীব খাঁ সাহেবের পুত্র খলিফা সগীর খাঁ ও পৌত্র বীণকার দবীর খাঁ সাহেব কলিকাতায় স্থায়ী-ভাবে অবস্থান করায় বঙ্গদেশে সেনী সঙ্গীতের স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা অশেষরূপেই বর্দ্ধিত হয়েছে। সেই সময়ে তাঁরা কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সঙ্গীত শিক্ষাদানে ইঁহারাও অকুণ্ঠিত ও উদার ছিলেন। আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল প্রভৃতি সর্বপ্রকার যন্ত্রসঙ্গীতই ইঁহারা আধারভেদে শিক্ষা দিতেন। তবে ইঁহারা বিদ্যালয়ের পরিবর্তে নিজ-ভবনেই শিক্ষা দিতেন।

মদীয় পিতৃদেব সঙ্গীতপ্রাণ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায়ই তানসেনের বংশধরদের এ সময়ে এদেশে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় মহম্মদ আলিকে তিনিই আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। সেই সময়ে খলিফা সগীর খাঁ, বীণকার দবীর খাঁ ও বালক রবাবী সৌকত আলীর যাবজ্জীবন বৃত্তিভার তিনি গ্রহণ করায় সঙ্গীত-সরস্বতীর যথার্থ সেবা দেশে অনুষ্ঠিত হ'তে

পেয়েছে। মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁর ভবনে সৌকৎ আলীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সর্বোপরি বীণকার কুমার ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সগীর খাঁ ও দবীর খাঁর চিরজীবনের আশ্রয়ভার গ্রহণ করে সঙ্গীত সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

পরিশিষ্ট—ক

মধ্যযুগের গায়ক বাদকদের ইতিবৃত্ত

"তানসেনের" পাঠকবর্গের মধ্যযুগের গায়ক বাদকদের ইতিবৃত্ত জানার ইচ্ছা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেজন্য **মাদনুল মুসীকী**[1] নামক উর্দু গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হল।

জনাব ইমাম বলেছেন "আমার মাতামহ লক্ষ্ণৌ শহরে নবাব আসফউদ্দৌলার সভাসদ ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই গান বাজনার দিকে আমার একটু ঝোঁক ছিল। সৈন্যবিভাগের কাজে ভর্তি হওয়ার পরে আমার বাবা দিলাবর খাঁ এবং আমার মাতুল আলমুল্লা খাঁর কাছে আমি "সোজখানী" সঙ্গীত (মহরমের দশ দিন গাওয়া হয়) শিখেছিলাম। এঁরা দুজনেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এঁদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে থাকার সময়ে আসফউদ্দৌলার মামার (নবাব সালরজং এর) ছেলের সঙ্গে (নবাব হুসেন আলি খাঁ) আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। নবাব হুসেন আলি খাঁ সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সংসর্গে আসার পর থেকেই গান বাজনায় আমার বেশ উন্নতি হতে লাগল। পরে মীর আলি সাহেবের সাকরেদ হয়ে "সোজখানি" সঙ্গীতটি আমি তাঁর কাছ

১। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উর্দু ভাষায় লক্ষ্ণৌএর হকীম মহম্মদ করম ইমাম এই বইখানি লিখেছিলেন। নিজে তিনি সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন না বটে, কিন্তু সঙ্গীতে তাঁর গভীর জ্ঞান ও অনুরাগ ছিল। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে, লক্ষ্ণৌ থেকে এই বইখানি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়।

থেকে ভাল করে শিখে ছিলাম। এই সময়ে আমার লক্ষ্ণৌএর বাইরে যাবার প্রয়োজন ঘটল। বাইরে যাওয়ায় উপকৃতও হয়েছিলাম যথেষ্ট পরিমাণে—আমাদের সময়ের বিস্তর বড় বড় গায়ক বাদকদের সংসর্গে আসার সুযোগ আমার বহুল পরিমাণেই ঘটেছিল। অযোধ্যার রাজা নাসিরউদ্দীন হায়দার যখন মারা যান, তখন আমি বান্দার কলেকটরের আফিসে সেরেস্তাদার। বান্দাতে প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ নবাব জুল্‌ফীকর খাঁ তখন বাস করতেন। তাঁর সভাসদগণের মধ্যে অনেকেই নাম করা গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের গান বাজনা শোনার সুযোগ আমি প্রায় সর্বদাই পেতাম এবং বহুদিন পর্য্যন্ত এ সুযোগ আমি ভোগ করতে পেরেছিলাম। বান্দায় থাকার সময় যে কয়েকখানি সঙ্গীতের বই আমি পড়েছিলাম সেগুলোর নাম নীচে লিখছি :—

(১) খুলাস্ তুল এশ্, (২) নঘমাতে আসফী, (৩) রিসালা মধনায়ক, (৪) রিসালা আমির খস্রু, (৫) রিসালা তানসেন, (৬) সঙ্গীত রত্নমালা, (৭) সঙ্গীত সার, (৮) সঙ্গীত দর্পণ ও (৯) সুরসাগর।

সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ আমি জীবনে মাত্র তুই জন দেখেছি। এক জন হচ্ছেন লক্ষ্ণৌএর **মীর আলি সাহেব,** অন্য জন এলাহাবাদের **বাবা রামসহায়।** সঙ্গীতশাস্ত্রের সমস্ত শাখাতেই এঁদের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বান্দার চাকরি ছেড়ে আমি লক্ষ্ণৌতে চলে আসি। তখনও নবাব ওয়াজেদ আলি খাঁ সাহেব লক্ষ্ণৌএর গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শ্বশুর নবাব ইক্রা-

মোদ্দৌলার চাকরিতে আমি বহাল হয়েছিলাম। লক্ষ্ণৌ সহর যত দিন পর্যন্ত ইংরেজের অধিকারে না এসেছিল ততদিন তিনি সেখানেই ছিলেন।

প্রাচীন নায়কদের নাম আপনাদের অবগতির জন্য লিখছি :—

(১) ভান্নু—অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন,

(২) লোহঙ্গ,

(৩) ডালু,

(৪) ভগবান,

(৫) গোপালদাস,

(৬) বৈজু,

(৭) পাঁড়ে,

(৮) চর্জু,

(৯) বক্সু,

(১০) ঢুঁড়ী,

(১১) মীরামধ নায়ক। মীরামধ নায়কের প্রকৃত নাম সৈয়দ নিজামুদ্দীন আহম্মদ। ১০৯৮ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল—তাঁর বাসস্থান ছিল বিলগ্রামী সহরে। তাঁব মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে কোন এক ব্যক্তি লিখেছিলেন :

"সুরপত দির্গ সুখত নহীঁ নিসদিন রহে উদাস।
মধনায়ককে মরতহি চহুঁ দেস ভয়ে উপাস॥"

পূর্বোক্ত সমস্ত গায়কেরাই ধ্রুপদ গাইতেন।

(১২) আমীর খশ্রু। এঁর যোগ্যতা সকলের চেয়ে বেশি ছিল। খেয়াল গানের, তিনিই সর্ব প্রথম প্রচলন করেছিলেন।

প্রসিদ্ধ খেয়ালীদের নাম দেওয়া হল :—

(১) আমীর খশ্রু—হজরত,

(২) সুলতান হুসেন শর্কী—জৌনপুরের রাজা,

(৩) চঞ্চল সেন,

(৪) বাজ বাহাদুর—মালবাধিপতি,

(৫) সুরজ খাঁ,

(৬) চাঁদ খাঁ,

(৭) গোলাম রসুল—লক্ষ্ণৌএর অধিবাসী। আমাদের সময় পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়িকদের নাম :—

(১) গোলাম নবী (শৌরী)। এঁর বাবার নাম ছিল গোলাম রসুল,

(২) গাবু,

(৩) শাদী খাঁ—গাবুর ছেলে, খেয়ালও গাইতেন,

(৪) বাবুরাম সহায়—টপ্পা বাদে তিনি অন্যান্য গানও গাইতেন।

(৫) নবাব হুসেন আলি খাঁ,

(৬) মীর আলি সাহেব। শেষোক্ত দুইজনই লক্ষ্ণৌতে থাকতেন।

পূর্বের ইতিহাস :—

আকবর বাদশাহের সময় প্রসিদ্ধ দুজন গুণী লোক বেঁচে ছিলেন। একজনের নাম গোপাললাল, অন্য জনের নাম ছিল

বৈজু। আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালের বৈজু এবং গোপাল নায়ক পৃথক ব্যক্তি। এই বৈজু কারোর চাকরি করতেন না—শেষ জীবনে তাঁর বৈরাগ্য এসেছিল এবং তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেছিলেন।

আকবর বাদশাহের রাজ সভায় চার জন মহাগুণী লোক থাকতেন। নীচে তাঁদের নাম দেওয়া হল ঃ—

(ক) তানসেন—গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়রে থাকতেন। তাঁর পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। তিনি বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য।

(খ) ব্রিজচন্দ—জাতিতে ব্রাহ্মণ, দিল্লীর কাছে ডাগুর নামক গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল।

(গ) রাজা সমোখন সিংহ—জাতিতে রাজপুত, খাণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী, বীণকার।

(ঘ) শ্রীচান্দ—রাজপুত, নোহার নামক স্থানের অধিবাসী।

এই চারজন লোকের চারটি বাণী তখন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

(ক) তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তাঁর বাণীর নাম হয়েছিল "গৌড়ী" অথবা "গোবরহার"। আজকাল তানসেনের বংশধর জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এই "গৌড়ী" বা "গোবরহার" বাণী গেয়ে থাকেন।

(খ) সমোখন সিং প্রসিদ্ধ বীণকার ছিলেন। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার পরে তাঁর নাম হয়েছিল নৌবাদ খাঁ। পরে তিনি তানসেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। নৌবাদ খাঁর

বংশতালিকা নীচে দেওয়া হল।[২] এই সমোখন সিং বা বড় নৌবাদ খাঁর বাণীর নাম ছিল "খাণ্ডারী" বাণী।

(গ) ব্রিজচন্দ—ইঁহার বংশধর ইউসুফ খাঁ ও উজীর খাঁ ধ্রুপদিয়া। উজীর খাঁ বোম্বাইয়ের মহারাজা জীবনলালের দরবারে গান গাইতেন।

(ঘ) শ্রীচান্দ। তানরস খাঁ[৩] এঁর বংশধর—তিনি দিল্লীতে থাকতেন।

২।
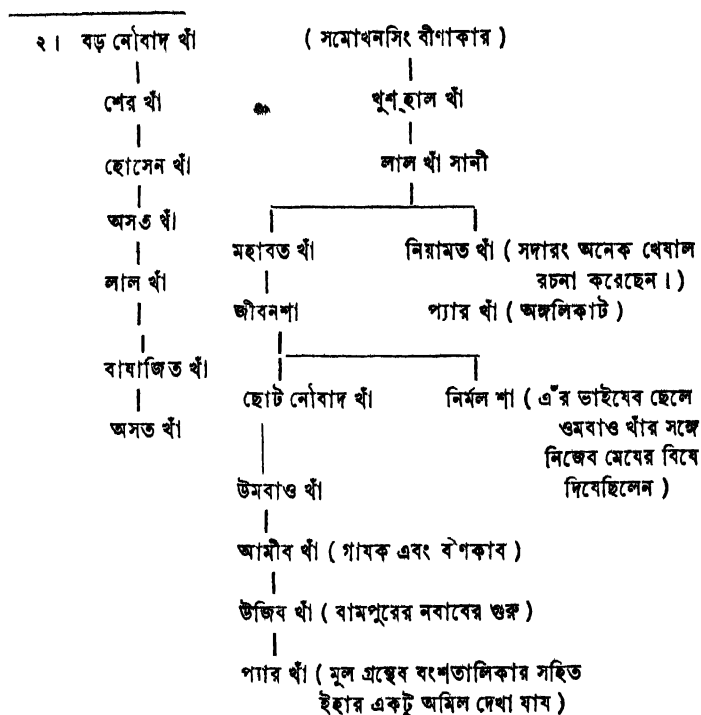
৩। বোম্বাইয়েব "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীতে" একবার এঁর জলসা হয়েছিল। ইনি হায়দ্রাবাদে নিজামের চাকরি করতেন। ৪৫ বৎসর পূর্বে এঁর মৃত্যু হয়।

আকবর বাদসাহের সময়ে "রাগসাগর" নামক গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের রাগ বর্ণনা "মানকুতূহল" নামক গ্রন্থ হইতে পৃথক। আমার মতে গোয়ালিয়রের রাজা মানের দরবারের চেয়ে আকবর বাদশাহের দরবারে অপেক্ষাকৃত অধিকতর গুণ সম্পন্ন গায়কেরা বাস করতেন। রাজা মান তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত নায়ক ছিলেন। "মানকুতূহল" গ্রন্থের রাগ বর্ণনা তাঁরই কথামত লেখা হয়েছিল।

আমার মতে আকবরের সময়ের সকল গায়কেরাই "অতাঈ" ছিলেন। যাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রে জ্ঞান নাই আমি তাঁকেই "অতাঈ" বলি। তানসেন যে একজন শ্রেষ্ঠতম গায়ক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হাজার বছরের মধ্যেও যে তাঁর মত একজন গায়ক জন্মগ্রহণ করে নাই সে কথাও সত্য, কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে যে তাঁর জ্ঞান ছিল না এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই। তানসেনের সময়ের সুজান খাঁ, সুরজ্ঞান খাঁ (ফতে পুরী), চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, মায়াচাঁদ (তানসেনের শিষ্য), তান তরঙ্গ খাঁ, বিলাস খাঁ (তানসেনের পুত্র), রামদাস ঘুঁড়িয়া, দাউদ খাঁ ধাড়ী, মোল্লা ইসাখ ধাড়ী, খিজির খাঁ, নৌবাদ খাঁ এবং হোসেন খাঁ—এঁরা সকলেই যে "অতাঈ" ছিলেন একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। বরঞ্চ বাজবাহাদুর, নায়ক চর্জু, নায়ক ভগবান ঢুঁড়ী, সুরতসেন (তানসেনের পুত্র) লালা দেবী (ব্রাহ্মণবন্ধু), আকিল খাঁ (বাকর খাঁর পুত্র)— এঁদের কিছু কিছু শাস্ত্র জ্ঞান ছিল; কিন্তু এঁদের কেহ ভানু, পাঁড়ে কিম্বা বক্সুর মত এত বিদ্বান ছিলেন না।

আকবরের পরে যে সমস্ত গুণী লোকেরা জন্মেছিলেন তাঁদের নাম কাশ্মীরের সুবাদার ফকিরউল্লা তাঁর রাগ দর্পণ নামক গ্রন্থে এই প্রকার লিখেছেন ঃ—

১। সেখ বাহারউদ্দিন বর্ণা—ইনি শাহ্‌জাহান বাদশাহের দরবারে থাকতেন। পরে দরবেশ হয়ে ছিলেন এবং আজন্ম অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মার্গরাগ গাইতে পারতেন। রবাব এবং বীণা বাজাতেন। ধ্রুপদ, হোরী, তারানা ইত্যাদি অনেক গান রচনা করেছিলেন।

২। সেখ পীর মহম্মদ—ইনি বর্ণার একজন দরবেশ বন্ধু ছিলেন। ইনিও একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। অনেক খেয়াল, তারানা ইত্যাদি ইনিও রচনা করেছিলেন। এই সব বাদে 'ভীমসিরী', 'সংকত' প্রভৃতি নূতন রাগও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন।

৩। মিয়া দাহু ধাড়ী—তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন। 'ঘট' নামক বাদ্যযন্ত্র তিনি বাজাতেন।

৪। লাল খাঁ কলাবন্ত—ইনি বিলাস খাঁর জামাই। এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

৫। জগন্নাথ কবিরাজ—তানসেনের পরে এই রকম গুণী আর জন্মগ্রহণ করে নাই। তানসেন নিজে বলতেন—"আমি ছাড়া জগন্নাথ কবিরাজের মত গুণী ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেউ নাই।" ১০০ শত বর্ষ বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।[৪]

৪। ইনিই বোধ হয় ভাবভট্টের পিতা জনার্দন, কারণ ভাবভট্ট তাঁর পিতার নামও জনার্দ্দন লিখেছেন।

৬। সোভালসেন—তানসেনের নাতি। ইনি ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন।

৭। সুদাস সেন—ইনি সোভাল সেনের পুত্র এবং কবি। প্রথমে শাহসুজার দরবারে থাকতেন। শেষে কাশ্মীরের ফকীর উল্লা দেওয়ানের কাছে ছিলেন (হিজ্‌রী ১০৮২)।

৮। মিশ্রী খাঁ ধাড়ী—বিলাশ খাঁর শিষ্য। সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহসূজার কাছে চাকরি করতেন। তিনি বাঙ্গলা দেশেই থাকতেন।

৯। হসন খাঁ কব্বান—ইনি বিদ্বান ছিলেন না। এঁর বাসস্থানেরও কোন স্থিরতা ছিল না।

১০। গুণসেন—এঁর প্রকৃত নাম ছিল আফজুল। ইনি নায়ক ভানুর বংশধর। গীত এবং সঙ্গীত দুই-ই তিনি ভাল গাইতে পারতেন—মার্গ রাগও তাঁর জানা ছিল। কাশ্মীরে মৃত্যু হয়েছিল।

১১। সেখ কমাল—মিয়া দাউধারী এঁরই শিষ্য ছিলেন। ইনি গায়ক ছিলেন এবং কাশ্মীরে ফকিরউল্লা দেওয়ানের কাছে চাকরি করতেন।

১২। বখত খাঁ—ইনি কলাবন্ত ছিলেন। গুজরাটে থাকতেন।

১৩। রংগ খাঁ—কলাবন্ত।

১৪। খুশহাল খাঁ—লাল খাঁর ছেলে ইনি গুণসমুদ্র উপাধি পেয়েছিলেন।

১৫। গোলাম মোহীউদ্দিন—ইনি তুর্কী বংশীয় কবি ছিলেন।

১৬। সাবদ খাঁ ধাড়ী—ইনি গায়ক এবং কবি ছিলেন। এঁর বাসভূমি ছিল ফতেপুরে।

১৭। কান খাঁ কলাবন্ত—শাহসুজা এঁকে শাহজাহান বাদশাহের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

১৮। বল্লীধারী—আগ্রায় এঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১৯। সলীম চাঁদ ডাগুর—ইনি উত্তম গায়ক ছিলেন। এঁর স্বরচিত গান অনেক আছে।

২০। সেখ সাহুল্লা—লাহোরের প্রসিদ্ধ গায়ক। অতিরিক্ত আফিং খাওয়ায় তাঁর গলার আওয়াজ বিগড়ে গিয়েছিল।

২১। পূজা—শের মহাম্মদের ভাই। কাশ্মীরে ফকিরউল্লা দেওয়ানের কাছে চাকরি করতেন।

২২। মহম্মদ বাগী—উত্তম গায়ক এবং কবি ছিলেন, কিন্তু আফিং খাওয়ার ফলে তাঁরও কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

২৩। বায়াজিত খাঁ—কলাবন্ত।

২৪। রুদ্র কব্বাল

২৫। ধরমদাস—কলাবন্ত।

২৬। রহীমদাদ ধাড়ী

২৭। কবজ্যোত ধাড়ী

২৮। ইঢ়েসিং—রাজা রোঝ আফজুনের পুত্র। আমীর খশ্রুর গান গাইতেন। তারানাও তাঁরই মত গাইতে পারতেন।

২৯। মীর ইমাই—ইনি সৈয়দ বংশীয় কবি।

৩০। হমীরসেন এবং তাঁহার পুত্র সোবালসেন—এঁরা দুজনই প্রসিদ্ধ কলাবন্ত ছিলেন।

৩১। সয্যদ তীব্র—"মধ" নামটি তিনিই গীতে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না।

৩২। সুন্দরঘন—উত্তম কবি ছিলেন কিন্তু গান গাইতে পারতেন সাধারণ ভাবে।

৩৩। উজীর খাঁ নোহার—ইনি সুজান খাঁর নাতি। উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। গীত এবং ধ্রুপদ দুই-ই গাইতে পারতেন। আমীর খশ্রুর খেয়ালও উত্তম গাইতেন।

যে সমস্ত গায়কেরা বাজাতেও পারতেন এইবার তাঁদের নাম দেওয়া হল :—

১। হৈয়াত—ইনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের চাকরি করতেন এবং "সরসমীন" উপাধি পেয়েছিলেন।

২। বায়াঝিদ্ রবাবী—অত্যন্ত গুণী লোক ছিলেন। এরূপ গুণী বিরল। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য এঁর অকাল মৃত্যু হয়েছিল।

৩। শিখরসেন কলাবন্ত—ইনি বায়াঝিদের শিষ্য। এঁর মত রবাবী দুইজন দেখা যায় না।

৪। সালে রবাবী ধাড়ী—ইনি বহুদিন কাশ্মীরে সুবাদারের চাকরিতে ছিলেন।

৫। হয়াতী রবাবী—এঁর হাত অতি মিষ্ট।

৬। কর্যাঙ্গ—মার্গ সঙ্গীত গাইতে পারতেন। কাশ্মীরে থাকতেন। "মৃদঙ্গরাজ" উপাধি পেয়েছিলেন।

৭। আমানুল্লা—পাখোয়াজী। কাশ্মীরে চাকরি করতেন। উত্তম পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন।

৮। ফিরোজ ধাড়ী—লাহোরে থাকতেন। সেখানে তাঁর মত ভাল পাখোয়াজ কেউই বাজাতে পারতেন না।

৯। তাহীর—ডফ বাদক। প্রবীণ বয়সে এঁর মৃত্যু হয়েছিল।

১০। আল্লাদাদ ধাড়ী—সারঙ্গী বাজাতেন। জলন্ধরের কাছে বাড়ী ছিল। দোয়াবে তাঁর মত সারঙ্গী আর কেউ-ই বাজাতে পারতেন না।

১১। রসবীন—এঁর প্রকৃত নাম মহম্মদ।

১২। শোগী—তুম্বুবা বাদক। পার্শী ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তুই-ই জানতেন।

১৩। আবু আলুবা—তম্বুরা বাজাতেন। এই যন্ত্রটি পারস্য দেশীয়, হিন্দুস্থানের তুম্বুরা নয়।

১৪। তারাচাঁদ কলাবন্ত—শোগীর শিষ্য।

১৫। ভগবান—তানসেনের সঙ্গে থাকতেন। প্রথমতঃ দিল্লীতে আকবর বাদশাহের কাছে ছিলেন, পরে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন।

১৬। আমীর—সুরণা নামক যন্ত্র বাজাতেন।

যাঁদের কথা উপরে লেখা হল এঁরা সবাই প্রাচীন লোক। এঁদের সমকক্ষ লোক আরও ছিলেন।

নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে গায়ক বাদক কে কে ছিলেন এখন তাই লিখছি। এই সব গায়ক বাদকদের কেউ কেউ লক্ষ্ণৌতে মারা যান—কেউ বা নবাব সাদত আলি খাঁর রাজত্ব-কালে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। উক্ত নবাবের গান বাজনার বিশেষ সখ ছিল না।

পূর্বোক্ত গুণীগণের পরের এবং আমার পূর্বের লোকদের নাম করা যাচ্ছে ঃ—

১। মিয়াঁজানী এবং মিয়াঁ গোলাম রসুল—এঁরা অত্যন্ত গুণী ছিলেন। এঁদের আত্মাভিমানও খুবই বেশি ছিল। একবার এঁরা নবাব হোসেন রেজা খাঁর বাড়িতে গান গাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে নবাব আসফউদ্দোলার চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। লোকে বলে এঁদের গান শুনে বুলবুল প্রভৃতি পাখি এসে কাছে বসত।

২। শক্কর খাঁ এবং মখ্খন খাঁ—অত্যন্ত গুণী। প্রসিদ্ধ বড় মহম্মদ খাঁ কব্বাল শক্কর খাঁর পুত্র। শক্কর খাঁ লক্ষ্মৌতে থাকতেন।

৩। সোণা ও মখন—এই দুই বন্ধুই কব্বাল ছিলেন। বিশেষ প্রসিদ্ধিও লাভ করেছিলেন।

৪। মিয়াঁশোরী—প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক।

৫। মিয়াঁ ছজ্জূ খাঁ কলাবন্ত—তানসেনের ঘরের গৌড়ীয় বাণীর ধ্রুপদ গাইতেন।

৬। মিয়াঁ জীবন খাঁ—ছজ্জূ খাঁর বন্ধু। মার্গ ও দেশী রাগ গাইতেন। উৎকৃষ্ট রবাব বাজাতে পারতেন। আসফউদ্দোলার রাজত্বকালে এঁর মৃত্যু হয়।

৭। নবাব সালরজঙ্গ—সুজাউদ্দোলার কুটুম্ব, গমক এবং আকারে এঁর জুড়ী ছিল না। হোরী ও ধ্রুপদ গাইতেন।

৮। নবাব কাসীম আলি খাঁ—সালরজঙ্গের ছেলে। উৎকৃষ্ট গাইতে পারতেন।

৯। মিয়াঁ গন্মু—কব্বাল শৌরীর শিষ্য। হিন্দুস্থানে এঁর জন্যেই টপ্পা লোকপ্রিয় হয়েছিল। প্রসিদ্ধ শাদী খাঁ এঁরই ছেলে। শাদী খাঁও ঠিক বাপের যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কাশীর রাজা নারায়ণসিংহের কাছে ইনি থাকতেন।

আমার সময়ের (১৮৫৩ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ গুণীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই এখন বেঁচে আছেন। এখন আর শাস্ত্রজ্ঞান তেমন দেখা যায় না। আমার সময়ের গুণীদের নাম লিখছি :—

"ধাড়ী" পদবীটি প্রাচীন গায়ক বাদকদের নামের সঙ্গেই পূর্বে ব্যবহৃত হত। ইতিহাসে দেখা যায় যে উক্ত উপাধীধারী গায়ক বাদকেরাও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে জীবিকা অর্জন করতেন। তাঁরা "করকা" নামক গীতগুলি গাইতেন। এই সকল গায়কেরা পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বক্সু নামক এক ব্যক্তি নায়ক উপাধিও লাভ করেছিলেন। ধাড়ীদের পূর্ব গৌরব এখন নষ্ট হয়ে গেছে।

কব্বাল ও কলাবন্তেরা প্রথমতঃ সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও আদর যত্ন পেতেন। "কব্বাল" নামটির প্রচলন হয়েছে আলা-উদ্দিন খিলজির সময় থেকে আর 'কলাবন্ত' নামটি আকবরের রাজত্বের সময়ে প্রচলিত হয়েছিল।

তানসেনের বংশধরগণের মধ্যে আজকালও কেউ কেউ গান গেয়ে থাকেন—কেউ কেউ বা রবাব বাজান। প্যার খাঁ, জাফর খাঁ ও বাসত খাঁ এঁরা সকলেই তানসেনের বংশধর। জাফর খাঁ হচ্ছেন ছর্জু খাঁর পুত্র—তাঁরমত রবাব বাদক আজ আর হিন্দু-স্থানে নেই। জাফর খাঁ লক্ষ্ণৌএর প্রসিদ্ধ নবাব ওয়াজেদ্ আলি

খাঁ সাহেবের গুরু। প্যার খাঁ "সুর-শৃঙ্গার" নামক নূতন একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। জাফর খাঁ গায়ক ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র কাসিম আলি খাঁ রবাব বাজান। তিনি পারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। কাসিম আলি "অরমুদ্দৌলা" পদবী লাভ করেছেন। জাফর খাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম রহাতুদ্দিন এবং তৃতীয় পুত্রের নাম নিসার তল্লী। বাসত খাঁর চারি পুত্র।

রামপুরের যে অতি প্রসিদ্ধ সুর শৃঙ্গার বাদক হোসেন খাঁ ছিলেন, তিনি প্যার খাঁর ভগ্নীর পুত্র। প্যার খাঁর নিজের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় ভাগিনেয়কেই সুর-শৃঙ্গার বাজাতে শিখিয়েছিলেন। পরে তাকেই দত্তক গ্রহণ করেন। হোসেন খাঁর মত সুর-শৃঙ্গার আর কেউই বাজাতে পারে না। তান-সেনের বংশধরগণের সকলেই অত্যন্ত অভিমানী।[৫]

মিয়াঁ জীবন খাঁব দুই পুত্র—বাহাদুব খাঁ, ও হায়দর খাঁ। বড় ছেলে উৎকৃষ্ট রবাবী ছিলেন। ছোট ছেলেটি ছিলেন ওয়াজেদ আলি শাহেব দেওয়ান নবাব আলি নক্কী খাঁর ওস্তাদ। হায়দার একটু পাগলাটে ধরনের ছিলেন, কিন্তু চমৎকার গান

৫। এদেব অভিমান ও বংশ মর্য্যাদাবোধ সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌতে এই গল্পটি প্রচলিত আছে। প্যাব খাঁব দত্তক পুত্র বাহাদুব হোসেন খাঁ প্যাব খাঁব সহোদব ভাই জাফর আলি খাঁর কাছে সুব শৃঙ্গাব বাজনাব উপদেশ চেযেছিলেন—তাতে জাফব খাঁ জবাব দিয়েছিলেন—"আমাব ঘবের বিদ্যা কখনও আমি পরেব ঘবে যেতে দেব না। অতঃপব প্যার খাঁ গোপনে তাঁকে সুব-শৃঙ্গাব বাজাতে শিখিযেছিলেন। জাফর খাঁ এতে এতই ক্রুদ্ধ হযেছিলেন যে জীবনে তিনি প্যাব খাঁব সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নি। এমন কি প্যাব খাঁর মৃত্যু কালেও একবাব গিযে তাঁকে দেখেন নি। এই দত্তক পুত্রই ছম্মন সাহেবেব পিতা হাযদব আলি খাঁ সাহেবকে সুর-শৃঙ্গাব বাজাতে শিখিযেছিলেন।

গাইতেন। আমি বহুদিন হায়দর খাঁর সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছি। এখন তাঁদের দুই ভাইয়েরই মৃত্যু হয়েছে। উমরাও খাঁ ও মহম্মদ আলি খাঁ দুজনেই বীণকার ছিলেন। উমরাও খাঁ-এর দুই ছেলে—রহিম খাঁ ও আমীর খাঁ।

এঁদের মধ্যে আমীর খাঁ হোরী নামক ধ্রুপদ গান গেয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি নিজে তাঁকে চিত্র-বিদ্যা শিখিয়েছি। তাঁর একেবারেই অভিমান ছিল না। তিনি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ছিলেন। উপরোক্ত গায়ক বাদকদের কেহ সমোখন সিংহের (নৌবাদ খাঁর) অর্থাৎ তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় কেহ বা সদারঙ্গের বংশধর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ও বাসত খাঁ—এঁরা সকলেই তানসেনের পৌত্রের বংশধর। বাদশাহদের রাজত্বকালে এই সকল গায়ক বাদকেরা দিল্লীতে থাকতেন। কিন্তু পরে নবাব সুজাউদ্দোলার সময়ে লক্ষ্ণৌতে (ফৈজাবাদ) চলে আসেন এবং পরে সেখানেই বাস করতে থাকেন। এঁদের গান জন সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

দিল্লীতে তানরস খাঁ নামক একজন উৎকৃষ্ট গায়ক আছেন। তিনি গজল গান করেন। তাঁর মত ভাল লোক অতি বিরল। কলাবন্ত ইমামবক্স পূর্বে আগ্রায় থাকতেন এখন দক্ষিণ দেশে চলে গেছেন। তিনি শাস্ত্রাভ্যাসও করেছিলেন। তাঁর বয়ঃক্রম একশত বৎসর হয়েছে। তাঁর ছেলে হুসেন খাঁ গীত বাদ্য জানেন না। আগ্রার উজির খাঁ ও ইউসুফ খাঁ নিজের বংশের ইতিহাসানুযায়ী "কলাবন্ত" ও মাতামহ বংশানুযায়ী "কব্বাল"

উপাধিধারী। এঁরা দুজনেই উত্তম হোরীধ্রুপদ গাইতেন। টপ্পা খেয়ালেও অনভ্যস্ত ছিলেন না। আমি ছয়মাস ধরে প্রত্যহ এঁদের গান শুনতে যেতাম। তাঁদের কসরতের সময় তাঁদের কাছে বসে থাকতাম। এঁদের মুখে যেমন গমক আমি শুনেছি সমোখন সিংহের বংশের আর কারো মুখেই আমি সে প্রকার গমক শুনি নাই। এঁদের পিতার নাম নিজাম খাঁ এবং পিতামহের নাম কাঈম খাঁ। তাঁদের ধ্রুপদ গানও আমি শুনেছি।

দিল্লীর মৌজ খাঁও চমৎকার ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। লক্ষ্ণৌএর যে শঙ্কর খাঁর কথা আমি আগে বলেছি তার দুই ছেলে। বড়টির নাম আহম্মদ খাঁ, ছোটটির নাম মহম্মদ খাঁ। মহম্মদ খাঁ-এর রাগ ও খেয়াল আহম্মদ খাঁ-এর চাইতে শুদ্ধতর। সকলেই স্বীকার করেন যে দক্ষিণ দেশে মহম্মদ খাঁর মত ভাল গায়ক আর হয় নাই। তিনি হিন্দু প্রথানুযায়ী মাথার মাঝখানে এক গুচ্ছ চুল রাখতেন এবং হিন্দুর মতই তা বাঁধতেন। তিনি অতি সজ্জন ও ভদ্র ছিলেন। রেওয়ার রাজ দরবারে তাঁর হাজার টাকা মাইনের চাকরি হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহম্মদ খাঁ প্রথমতঃ গোয়ালিয়রে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দরবারে চাকরি করতেন। গোয়ালিয়রের লোকের মুখে তাঁর সম্বন্ধে দুইটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আজও শুনা যায়। গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁকে ১২০০৲ টাকা বেতন দিতেন। একজন উৎকৃষ্ট দরবারী গায়করূপে তিনি এখানে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে-ছিলেন। এই সময়ে হদ্দু খাঁ ও হস্সু খাঁ নামক দুই জন তরুণ

গায়কও এখানে চাকরি করতেন। এঁরা পীরবক্স খাঁর ঘরের গান গাইতেন। গোয়ালিয়রে তাঁদের ধ্রুপদ অঙ্গের ও আলাপ ঢঙ্গের খেয়ালগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মহারাজা মহম্মদ খাঁর তান অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনি হদ্দু ও হস্সু খাঁকে উক্ত প্রকারের তান তৈরী করতে আদেশ দিলেন। তাঁরা দুই চার মাস দৈনিক একবার করিয়া মহম্মদ খাঁর তান শুনতে চাইলেন। পালঙ্গের নীচে লুকিয়ে থেকে প্রত্যহ মহারাজ তাঁদের মহম্মদ খাঁর গান শুনতে আদেশ দিলেন। ৬।৭ মাস পরে বৃহৎ একটি "জলসা" করে মহারাজ যুবকদ্বয়কে মহম্মদ খাঁর গান গাইতে আদেশ করলেন। যুবক দুইটি অবিকল মহম্মদ খাঁর গানগুলি গাইলেন। গান শুনে মহম্মদ খাঁ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন—"এখানে থেকে আমি বড়ই দাগা পেলাম, এরকম জায়গায় আমি কখ্খনো চাকরি করবো না।" এই বলেই তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। কারো কথা শুনলেন না। ১২০০৲ টাকা বেতনেও তাঁর খরচ কুলাত না। হাতীতে চড়ে তিনি দরবারে আসতেন।

গোয়লিয়রের মহারাজার মন্ত্রীর নাম ছিল ত্র্যম্বক রাও। মহম্মদ খাঁর ১২০০৲ টাকা বেতন নেওয়াটা ইনি মোটেই পছন্দ করতেন না। ব্যয়সঙ্কোচের অছিলায় মহম্মদ খাঁকে মাসিক ৩০০৲ টাকা মাইনে দেওয়া স্থির করে মহারাণী বায়জাবাঈকে গিয়ে সে কথাটা জানালেন। মহারাণী এবং অন্যান্য সকলেই তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করায় তিনি এক সরকারী পত্রদ্বারা মহম্মদ খাঁকে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। পত্র পেয়েই মহম্মদ

খাঁ চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হলেন ; কিন্তু যাওয়ার পূর্বে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রণাম করে যাবেন স্থির করে ছোট একটা তম্বুরী নিয়ে রাজবাড়ির দেউড়ীতে এসে দাঁড়ালেন। প্রহরীরা যখন কিছুতেই তাঁকে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যেতে দিলনা তখন তিনি দেউড়ীর একধারে বসে তোড়ী রাগের আলাপ আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চারদিকে লোক জমে গেল। মহারাজ প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণের সময় নিজ হাতে মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। দ্বিতলে, এই সময়ে তিনি মাথায় বাঁধার জন্য পাগড়ী হাতে তুলে নিয়েছিলেন মাত্র। গান শুনে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল— পাগড়ী আর বাঁধা হল না। বেলা ক্রমে ১২টা বেজে গেল— মহারাজা পাগড়ী হাতে করেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বায়জাবাঈ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ কি আজ স্নানাহার করবেন না?" ঠিক এই সময়ে গান থামল। মহম্মদ খাঁকে মহারাজা দ্বিতলে ডেকে এনে বললেন—"আহাহা এমন তোড়ী আমি জন্মেও শুনি নাই—আচ্ছা খাঁ সাহেব আজ আপনার এত বেলা হল কেন?" মহম্মদ খাঁ তখন মহারাজকে অভিবাদন করে আদেশ পত্রখানি তাঁর সম্মুখে রেখে বললেন— "মহারাজ, আজ পর্যন্ত আপনার যে অন্ন গ্রহণ করেছি তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। শিষ্য পুত্রকলত্রাদি নিয়ে ৩০০৲ টাকায় আমার কখনো চলবে না। পেট ভরে যেখানে অন্নজল পাব সেখানে চলে যাওয়া স্থির করে আজ শেষ গান আপনাকে শুনিয়ে, প্রণাম করে চির জন্মের মত বিদায় নিতে এসেছি।"

পত্র পড়ে রাগে মহারাজা লাল হয়ে উঠলেন—ত্র্যম্বককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—“এর মানে কি?” ত্র্যম্বক বললেন—“মহারাজ, আপনার অন্যান্য কর্মচারীদের তুলনায় মহম্মদ খাঁর বেতন ১২০০৲ টাকা অত্যন্ত বেশি বলে বোধ হওয়ায় ৯০০৲ টাকা বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠি আফিস থেকে পাঠিয়েছি। মহারাণী সাহেবাও এই আদেশ অনুমোদন করেছেন।” শুনে মহারাজ শান্ত হয়ে বললেন—“আঁপনি ভাল কাজ করেন নাই। আমাকে আর এক জন মহম্মদ খাঁ এনে দিতে পারলে এঁকে বিদায় দিতে পারেন্‌। দ্বিতীয় আর এক জন মহম্মদ খাঁ যখন পাওয়া যাবে না তখন বেশী মাইনে দিয়ে এঁকেই রাখতে হবে।” গোয়ালিয়রের গায়কেরা মহম্মদ খাঁর অনুকরণে নিজেদের গলা তৈরী করতেন বলেই খেয়ালে ভয়ঙ্কর তানবাজীর উদ্ভব হয়েছে।

এই মহম্মদ খাঁর চার ছেলে ছিল—(১) কুতুব অল্লী (ঔরস-জাত পুত্র), (২) মুনবর খাঁ, (৩) মুবারক আলী খাঁ ও (৪) মুরাদ আলি খাঁ। শেষোক্ত তিনজন তাঁর রক্ষিতার গর্ভজাত। কুতুব অল্লী পিতার সঙ্গে গান গাইতেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মুরাদ আলি খাঁ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন—উন্নতিও করেছিলেন যথেষ্ট। রজব আলি ও ফঝল আলিকেও মহম্মদ খাঁর বংশজাত বলে ধরা হয়। তাঁরাও উৎকৃষ্ট খেয়াল গাইতেন। ফঝল আলির মৃত্যু হয়েছে। আজকাল লক্ষ্ণৌএর মুরাদ আলি খাঁ খেয়াল ও টপ্পা উৎকৃষ্ট গাইতে পারেন। লক্ষ্ণৌ-এর অন্যান্য ধাড়ীরা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—এরা এখন তয়ফাওয়ালীদের পেছনে পেছনে ঘুরে

বেড়ায়—নিজেরা কেউ কিচ্ছু জানে না। হদ্দু খাঁ, হস্মুখাঁ, নথু খাঁ এবং নথন পীরবক্সের পুত্র গোলাম হোসেন—এঁদের প্রত্যেকের গানই বহুবার আমি শুনেছি। এঁরা বড্ড অহঙ্কারী—সর্বদাই ভাবেন যে ছুনিয়াতে এঁদের সমান আর কেউ নাই। গোলাম ইমাম ও হস্মু খাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রথম যখন হদ্দু খাঁর গান শুনেছিলাম তখন তাঁকে অত্যন্ত বুদ্ধি সম্পন্ন বলে বোধ হয়েছিল। পরে লক্ষ্ণৌতে দ্বিতীয়বার যখন তাঁর গান শুনি, তখন তাঁর গলা বসে গিয়েছিল। এঁরা সবাই গোয়ালিয়রে থাকতেন এবং প্রত্যেকেই ৪০০।৫০০৲ টাকা মাইনে পেতেন।

মীরাটের সাদী খাঁ ও মুরাদ খাঁ উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। লক্ষ্ণৌএর মুরাদালি খাঁর ছেলে সুলেমান মহম্মদ খাঁর বংশধর রজব আলি খাঁর শিষ্য ছিলেন। সুলেমান প্রাচীন নিয়মের তান পলট সহকারে উৎকৃষ্টরূপে খেয়াল গেয়ে থাকেন। পূর্বের প্রাচীন গায়কেরা কি ভাবে গান গাইতেন তা তাঁর গান শুনে বেশ বুঝতে পারা যায়।

নূর খাঁ ও মোগল খাঁ কালপীতে থাকতেন এবং উৎকৃষ্ট হোরী গান গাইতে পারতেন। শুনেছি যে তাঁদের দুজনেরই নাকি মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে হোরী গান গেয়েছেন এই রকম কোন একজন লোকের কাছ থেকে এ সংবাদ আমি পেয়েছি।

গোলাম রসুলের ভাগিনের মৌজ খাঁর বাড়ী তিরবানে। ইনি নেপালের দরবারে চাকরি করেন—ইনিও উৎকৃষ্ট খেয়াল গাইতে পারেন।

পরসাহু—ইনি বেনারসের একজন কথক গম্মুর পুত্র সাদী খাঁর শিষ্য। ইনি খেয়াল ও টপ্পা উৎকৃষ্ট গাইতে পারতেন।

করিম খাঁ—পাঞ্জাববাসী, উৎকৃষ্ট খেয়াল গায়ক।

সভ্য, সৌখিন এবং অ-পেশাদর উৎকৃষ্ট গায়কদের নাম করা যাচ্ছে :—

১। বাবুরাম সহায়—এলাহাবাদে থাকেন। ইনি হোরী, ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা উৎকৃষ্টরূপে গাহিতে পারেন। অভিনয়েও এঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। মীর আলি সাহেব বলেন—"বাবুরাম একালের নায়ক।"

২। সৈয়দ মীর আলি সাহেব—ইনি একজন কর্মঠ ওস্তাদ। ইনি খাজা বাসিদ পীরজাদার দোহিত্র ও সর্বপ্রকারের গানেই অভিজ্ঞ। অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদআলি খাঁ সাহেবের ইনি একজন সভাসদ ছিলেন। নবাবের জীবদ্দশায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। জন্মেও তিনি নবাব দরবারে যান নাই। না যাওয়ার জন্যে দেওয়ান নাসিজাদ্দিন তাঁর ৯০০৲ শত টাকা বেতন কমিয়ে দিয়েছিলেন। নবাব এঁকে লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে চলে যাবার আদেশ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন চলে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন তখনই নবাব আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক একটি পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই মীর আলি সাহেব অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে লোকে তাঁর গান শুনে আসত। স্বয়ং লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত না। মীর আলি সাহেব ধ্রুপদ শিখে-ছিলেন সেনি বংশীয় ছর্জু খাঁর কাছ থেকে—খেয়াল শিখেছিলেন

গোলাম রসুলের কাছে। শকর খাঁ, মখখন খাঁ এবং সেনীর কাছেও তিনি গান শিখেছিলেন। শৌরীর নিকট থেকে টপ্পা শিখেছিলেন। তিনি একজন বড় বিদ্বান ছিলেন। মোল্লা মহম্মদ সাহেবের কাছে তিনি পারসী শিখেছিলেন।

রামানুজ এবং নারায়ণ দাস নামক দুইজন বৈরাগী বুন্দেলখন্দে থাকতেন। খেয়াল গানে তাঁদের সমকক্ষ কেউই ছিল না। বাবুরাম সহায় খেয়াল এঁদের কাছেই শিখেছিলেন—হোরী ও ধ্রুপদ শিখেছিলেন তানসেনের বংশধর জীবন খাঁ সেনের কাছে।

নবাব কাসিম আলি খাঁর পুত্র নবাব সুলতান অল্লী খাঁ ধ্রুপদে সাতিশয় নিপুণ ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই নবাব হোসেন খাঁ উৎকৃষ্ট টপ্পা গাইতে পারতেন।

মীর আহম্মদ সাহেব ও আজীম সাহেব—প্রসিদ্ধ "সোঝ" গায়ক ছিলেন। ধ্রুপদ দুজনেই ভাল গাইতেন।

দিলবর আলি খাঁ হোরী গাইতেন। তিনি ও মীর আলি সাহেব উভয়েই ছর্জু খাঁর (সেনী) শিষ্য ছিলেন।

আলিমুল্লা খাঁ—ইনি মিয়াজান ও গোলাম রসুলের শিষ্য ছিলেন। মিয়া শৈফুল্লার কাছে ইনি "সোঝ" গান শিখেছিলেন।

টপ্পা গায়ক শৌরীর সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কিংবদন্তী শুনা যায়। টপ্পা গানের প্রচলন প্রথমতঃ এদেশে ছিল না। পাঞ্জাবী ভাষা এই গানের অত্যন্ত অনুকুল হবে বুঝতে পেরে শৌরী (গোলামনবী) পাঞ্জাবে গিয়ে বাস করতে লাগলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার ভাষা শিখে ফেললেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসে প্রত্যেক রাগেরই তিনি একটি করে

টপ্পা রচনা করে ফেললেন। প্রকৃত সাধকের ন্যায়ই তিনি এ বিষয়টির সাধনা করেছিলেন। এই সময়ে জাগতিক বিষয়ে তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিল না। লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের সঙ্গে একদিন পথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং নবাব বিশেষভাবে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ করেন। শৌরী বলেন, "আমি আপনার বাড়ী চিনি না।" নবাব বলেন, "পথ জিজ্ঞাসা করতে করতে যাবেন।" শৌরীর গান শুনে নবাব এতই খুশী হয়েছিলেন যে তাঁকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করে বিদায় দিয়েছিলেন। শৌরী কিন্তু বাড়ী ফেরবার পথে সমস্ত অর্থই দরিদ্রদের বিতরণ করে এসেছিলেন। এ কথা শুনে নবাব তাঁকে পূর্ব্ববৎ পুরস্কার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শৌরীর ঔরসজাত কোন পুত্র নাই। গম্মু নামক তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য ছিল মাত্র। গম্মুর পুত্রের নাম সাদী খাঁ। সাদী খাঁ বেনারসের রাজা উদিত নারায়ণের কাছে থাকতেন। সাদী খাঁকে বাবুরাম সহায়ের খলিফা বল হত। সাদী খাঁর মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ্ণৌতে বড়দরের টপ্পা গাইয়ে বললে মুম্মী খাঁ ও ছজ্জু খাঁকেই বোঝা যায়, কিন্তু পূর্ব্ববর্তী গায়কদের সঙ্গে তাঁদের কোন ক্রমেই তুলনা চলতে পারে না।

যন্ত্রবাদক প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণ

১। উমরাও খাঁ—উত্তর বীণকার। ইনি রামপুরের উজির খাঁর মাতামহ।

২। মহম্মদ আলি খাঁ—উজির খাঁর ভাই। উৎকৃষ্ট বীণকার। বেনারসের রাজার নিকটে থাকতেন।

৩। মীর নাসর আহম্মদ—তিনি প্রথমে সৈয়দ ছিলেন কিন্তু বীণা শেখার জন্য দিল্লীর কলাবন্ত বংশীয়া একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি খুব ভাল বীণা বাজাতে শিখে ছিলেন। কিন্তু নিজের ধর্ম ছাড়েন নাই। ওয়াজেদ আলি শাহ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তিনি যান নাই। তিনি উত্তম বাজাতে পারতের। তাঁর বাজনা আমি শুনেছি। গরীবকে সর্বদাই তিনি বাজনা শুনাতেন।

৪। রহিম খাঁ—উমরাও খাঁর পুত্র, উৎকৃষ্ট বীণকার।

৫। হসন খাঁ বীণকার ও উজির নবাব আলি নক্কী খাঁ—এঁদের বিষয়ে কি আর বলব—এঁরা সেতারের বাজনা বাজাতেন। বীণার কায়দা এঁদের হাতে আসত না।

৬। প্যার খাঁ ও বাহাদুর সেন খাঁ—উভয়েই উত্তম রবাব বাজাতে পারতেন। কাশেম আলি ও নিসার আলিও উৎকৃষ্ট রবাবী ছিলেন। বাহাদুর খাঁর মত সুরশৃঙ্গার বাদক আজকাল আর কেউ নাই।

প্রসিদ্ধ সেতার বাদকগণ

১। রহিম সেন—মশীত খাঁর পুত্র।

২। নবাব গোলাম হোসেন খাঁ—দিল্লীতে থাকতেন। নবাবের দরবারে এই বাদ্যের প্রচলন বহুদিন থেকেই ছিল। দিল্লীর নবাবের বাড়ীতে আমি বহুবার তাঁর বাজনা শুনেছি খুবই ভাল বাজাতেন।

৩। গোলাম রজা—গোলাম রজার সেতার বাদ্য প্রসিদ্ধ। সঙ্গীত শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তাঁর বাদ্যের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। বাদ্যের গতি ছিল কতকটা ঠুংরির মত। তাঁর বাদ্য শুনবার জন্য লোক পাগল হত কিন্তু তাঁর "ঠোক্", "ঝালা" যোগ্যস্থানে হত না। বড় বড় ওস্তাদেরা কিন্তু এপ্রকারে বাজাতেন না। মর্মজ্ঞ শ্রোতারাও এরকম বাজনা ভালবাসতেন না। শুনা যায় লক্ষ্ণৌ এর "রৈস্"-দের খুশী করবার জন্যই নাকি তিনি এই প্রকার বাজনার আবিস্কার করেছিলেন।

৪। গোলাম মহম্মদ—বাড়ী বান্দা, উত্তম সেতার বাজাতেন। তাঁর বাজনায় যে প্রকারের "ঠোক্" ব্যবহৃত হ'ত সে প্রকারের ঠোক্ এক উম্‌রাও খাঁ ব্যতীত আমি আর কারো কাছে শুনি নাই। গোলাম বীণা ও রবাব সেতারের চেয়ে খারাপ বাজাতেন না। আমরা দুজনে একই গুরুর কাছ থেকে চিত্র বিদ্যা শিখেছিলাম। গোলামের ছেলে সজ্জাদ মহম্মদও ভাল বাদক। অল্প দিন হল বলরামপুরে গোলামের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে সজ্জাদ মহম্মদ কোলকাতায় গিয়ে রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের চাকরিতে বহাল হয়েছিল।[১]

৫। বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ—বাবুরাম সহায়ের পুত্র। উত্তম সেতার বাজাতেন। শেষে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

---

[১] "অধুনা প্রসিদ্ধ ইম্‌দাদ খাঁও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চাকরি করেছেন। শুনা যায় তিনি সজ্জাদের বাজনা শুনে বাজাতে শিখেছিলেন। সজ্জাদের বাজনা শুনতে না পেলে ইম্‌দাদ খাঁকে আজ কেউ-ই চিনত না।"—'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'র ৪র্থ ভাগে ভাতখাণ্ডে এই মন্তব্যটি করেছেন।

৬। রাজ পাই—প্যার খাঁ জাফর খাঁর শিষ্য বলে পরিচিত। ইনি দুইটি "মেরজাপ" দিয়ে সেতার বাজাতেন। এঁর রাগগুলি আমি ভাল বুঝতে পারি নাই।

৭। বরকত উর্ফ সন বহা—প্যার খাঁর শিষ্য। ফরাক্কাবাদে থাকেন, ভাল বাদক।

৮। নবাব ইশমত জঙ্গ—প্যার খাঁর শিষ্য। অল্প বয়সে মৃত্যু হয়েছিল।

৯। নবাব অল্লী নকী খাঁ—ওয়াজেদ আলি শাহের দেওয়ান হাইদার খাঁর শিষ্য। উৎকৃষ্ট গান গাহেন। তিনি ঘসিট খাঁর চেয়েও হোরী ভাল গাইতে পারেন।

১০। ঘসিট খাঁ—হাইদার খাঁর শিষ্য। কণ্ঠস্বর চমৎকার—উৎকৃষ্ট সেতার বাজাতেন।

১১। কুতুব আলি কুতুবুদ্দৌলা—প্যার খাঁর শিষ্য। খুব ভাল সেতার বাজাতেন।

১২। নবীবক্স—ডেরাদার আমীরজানের ভাই। গোলাম মহম্মদের শিষ্য। শেষ বয়সে উত্তম সেতারী হয়েছিলেন।

উত্তম সারেঙ্গী বাদকগণ

(১) দিল্লীর অলি বক্স, (২) লক্ষ্ণৌ-এর হোসেন বক্স, (৩) সাবিত অল্লী (গোয়ালিয়র)—এঁরা সকলেই উত্তম সারেঙ্গী বাজাতে পারেন। (৪) ইব্রাহিম খাঁ, (৫) মহম্মদ অল্লী খাঁ—উৎকৃষ্ট সারেঙ্গী বাজান। মহম্মদ অল্লী বাবুরাম সহায়ের কাছে টপ্পা শিখেছিলেন। (৬) হিম্মত খাঁ রাঠ পটওয়ারী, (৭) খাজাবক্স

(খুর্জ্জা), আমীর খাঁ বীণকারের শিষ্য—কেবল সারেঙ্গীই বাজান। (৮) বহাজুদ্দিন ধাড়ী (লক্ষ্ণৌ) সারেঙ্গী উত্তম বাজাতেন। (৯) গোলাম তল্লী (ডোম)—রামপুর—আমাদের সময়ের একজন উৎকৃষ্ট শরোদ বাদক—এখন মৃত।

নাকাড়া মুরসলী (চৌ-ঘড়া) বাদকগণ

(১) কাসিম খাঁ (আসীওয়ান), (২) ধুরন খাঁ (উনাও), (৩) সোভান খাঁ (বেনারস)—এঁরা প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট মুরসলী বাজাতেন। (৪) রাজা রঘুনাথ রাও বাহাদুর (ঝান্সী)—ইনি উত্তম নাকাড়া বাজাতেন। (৫) ঝব্বু (উনাও), (৬) মখদুম বক্স (লক্ষ্ণৌ)—উত্তম নাকাড়া বাজাতেন।

সানাই ইত্যাদি

(১) আহম্মদ আলি (বেনারস)—অতি মধুর সানাই বাজান কখন কখন সারেঙ্গীর সঙ্গেও বাজিয়ে থাকেন। (২) আহম্মদ খাঁ ধাড়ী (আসীওয়ান), (৩) ধুরন খাঁ (উনাও)—এঁরা ইউরোপীয় বাদ্য ক্লারিওনেট, ফ্লুট, জলরঙ্গ ইত্যাদি বাজিয়ে থাকেন। (৪) ঘসিট খাঁ—বান্দার রৈসেরদিকে থাকতেন। অলপূজা (এক প্রকারের ক্ষুদ্র বাঁশী) ও ছোট সানাই বাজাতেন। ইনি বীণকারের শিষ্য। (৫) কালু, (৬) ধনুধাড়ী (বেনারস)—উৎকৃষ্ট সারেঙ্গী বাজান এবং খেয়ালও গেয়ে থাকেন।

প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী

১। লালা ভবানীপ্রসাদ সিংহ—অপ্রতিম পাখোয়াজী। ২। কুদৌ সিংহ (বান্দাবাসী ব্রাহ্মণ) ভবানী সিংহের শিষ্য—

সর্ব্বোত্তম পাখোয়াজী। অযোধ্যার নবাব এঁকে "কুম্বরদাস" উপাধি দিয়েছিলেন। একবার ওয়াজেদ আলি শাহের বাড়ীতে একটি "মাইফেলের" সময়ে কুদৌ সিংহ ও জোত সিংহের মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ক বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল। বিজয়ীকে পুরস্কৃত করবার জন্যে নবাব হাজার টাকার একটি থলি হাতে করে বসে ছিলেন। পুরস্কার কুদৌ সিংহই লাভ করেছিলেন। ৩। তাজ খাঁ (ডেরেদার)—স্বকীয় গুণরাজির দ্বারা গোলাম মহম্মদ সেতারীর মত ভবানী সিংহের স্থান অধিকার করেছিলেন। জনসাধারণও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করত। নিজের ছেলে নাসর খাঁকেও তিনি উত্তম "তৈয়ারী" করেছিলেন। এই ছেলেটিও কুদৌ সিংহের মতই হয়েছিল। কুদৌসিংহের হাত বড়ই মিঠা ছিল। অত্যন্ত বলবান নাসর খাঁর হাত ছিল একটু কর্কশ। সঙ্গীত শাস্ত্র জ্ঞানে তাজ খাঁ কুদৌসিংহ অপেক্ষা অভিজ্ঞতর ছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস।

নৃত্য প্রবীণ ওস্তাদগণ

১। লালুজী ও ২। প্রকাশ (লক্ষ্ণৌ-এর কথক)—উভয়েই অতি প্রবীণ অভিনেতা ছিলেন; ৩। দুর্গা—প্রকাশের মেয়ে—নৃত্যে অলৌকিকত্ব লাভ করেছিলেন। অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছিল; ৪। মানসিংহ ও তাঁর ভাই—উত্তম নাচতে পারতেন; ৫। বেণীপ্রসাদ ও ৬। পরসাদু (বেনারস) উভয়েই নৃত্যে ও অভিনয়ে কুশল ছিলেন; ৭। রামসহায় (হাণ্ডিয়া) কথকতা করতেন এবং অত্যন্ত গুণী ছিলেন; ৮। রসজ্ঞানী (মোহত); ৯। হোসেন বক্স;

১০। কায়েম অল্লী; ১১। মিরজা বহীদ কাশ্মিরী—এঁরা সকলেই লক্ষ্ণৌতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন; ১২। কানাইয়া—ওয়াজেদ আলি শাহের শিষ্য। অতি উৎকৃষ্ট নর্তক, অবিকল তাঁরই মত নাচতেন; ১৩। গুলবদন ও ১৪। সুখবদন (বেনারস)—নৃত্য ও অভিনয়ে বিশেষ দক্ষ; ১৫। অধবান (উনাও)—নাকারা এবং তবলা ভাল বাজাতে পারতেন; ১৬। বিলায়ত আলি ধড়ী (লক্ষ্ণৌ)—তবলাও ভাল বাজাতে পারতেন।

উত্তম তবলা বাদক

১। বক্স ধাড়ী—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ তবলা বাদক। ২। মম্মু—উত্তম 'গৎ' বাদক। ৩। সলারী—গৎ ও পরন উত্তম বাজাতেন। ৪। মক্‌খু—বাজান পুরানো ঢং-এ বটে কিন্তু বাজান ভাল। তাঁর ছেলেও উত্তম 'সঙ্গত' করতে পারেন। লক্ষ্ণৌতে তবলা বাজনা খুবই ভাল হত। বক্‌সু ও মক্‌সু খাঁর মৃত্যু হয়েছে আমার সময়ে। ৫। নজু—বক্‌সুর শিষ্য—আজকাল লক্ষ্ণৌতে ভাল-ভাবেই আছেন।"

মাদমুল মুসীকী গ্রন্থে প্রাচীন গুণী লোকদের ইতিহাস উপরিউক্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তানসেনেরও আধুনিক সময়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যেই মধ্যযুগের গায়ক-বাদকদের এই ধারাবাহিক বিবরণটি "তানসেনের" পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

পরিশিষ্ট—খ

সংগীত স্থদর্শন হইতে উদ্ধৃত :—

রোনা গানা কৌন নহি জানতা ; ঔর ইসসময় ভী এক-প্রকার কী সংগীত বিছা বড় হি রহী হ্যায়, কিন্তু ম্যায়নে জো বাত্ উপর লিখি হ্যায় বহ এক প্রৌঢ় সংগীত পরিপাটিকি লিখি হ্যায়, জো ইস সময়মে আকর নষ্ট হোরহী হ্যায়। ইসী প্রৌঢ় পরিপাটিকে অন্ত্যকালমে ধ্রুবপদকে স্থখসেনজী, তুল্হখাঁজী, হায়দর বক্স্জী ; সিতারকে রহিমসেনজী ; অমৃতসেনজী ; রবাব ঔর স্বরশৃঙ্গারকে বহাতুরসেনজী, সাদিক আলীখাঁজী ; বীণাকে রাগরসখাঁজী, রসবীণখাঁজী ; খেয়ালকে মহম্মদখাঁজী, হস্মু খাঁ হুদ্দুখাঁজী ; ইয়ে লোগ অন্তিম বড়ে নামী ওস্তাদ হোগয়ে ইন-লোগোকে অনন্তর প্রকৃত সংগীত পরিপাটি বহুত-হী ক্ষীণা হো গই।…

প্রথম সহ সংগীত বিছা হিন্দুওঁকে পাস থী বাদশাহী সময়সে মুসলমানোকে পাস জানে লাগি। মিয়াঁ তানসেনজীকে অনন্তর তো মানো ইস বিছানে হিন্দুওঁকো ত্যাগ হি দিয়া। তানসেন-জীকে পুত্রপৌত্রাদি তথা শিষ্যোনে ইস বিছাপর বহুত হি পরিশ্রম কিয়া খুব জান লড়াই।

শ্রীহরিদাস স্বামীজীনে আকবরকে লংকদহন সারং শুনাই তো বনমে অগ্নি লগ গই আকবর বহুত ডরে, তব স্বামীজীকে তানসেনজাকো মেঘরাগ গানেকো কহা, ইনকে মেঘরাগসে বর্ষা

হুই জিস্‌সে ওহ অগ্নি শান্ত হো গই। দীপকরাগ গানাসে উস্‌সময় গানেবালেকো ইত্‌না সন্তাপ হোতাথা কি উস্‌কা জীনা কঠিন হোজাতাথা ইসিসে তানসেনজীনে দীপককা গানা বন্ধ কর দিয়াথা। তানসেন বংশকে সংগীত বিদ্যাকে পাণ্ডিত্যসে চিড়কর কেবল ঈর্শাসে উনকে পরোক্ষমে বৈঠ বহুত লোগোনে উনকি নিন্দা কি ঔর আপনে মহত্ত্বকি গাথা গাই তো ভী উসসে কুছ না বোলা।

যদি মিয়ঁা তানসেনজী দীপক রাগকা নিরোধ ন করতে তো ভী ইস্‌সময় কোই অনিষ্ঠাপত্তিকি সম্ভাবনা ন থি কেয়োঁ কি জ্যায়সে ইস্‌সময়মে মেঘাদিরাগোসে বর্ষাদি ফল নহি হোতা; বৈসে দীপকরাগসে ভী ইস্‌সময় কোই ফল হোনেকি সম্ভাবনা ন থি তথাপি উস্‌কালমে কুছ লোগোকো দীপকরাগসে অনিষ্ঠ ফল হোতা ইসসে হি ইস রাগকা নিরোধ কর দিয়াগয়া এসা প্রতীত হোতা হ্যায়।

হমারে দেশমে প্রথম শান্তরসকা বড়া প্রস্তার থা ইস্ কারণ উসসময় বড়ে বড়ে ভগবৎভক্ত ঔর জ্ঞানী হো গয়ে। উস্‌সময় বিদ্যায়ে ভী বড়ী শান্ত থী। কাল সদা একসা নহি রহতা ইসসে তদনন্তর বীররসকা প্রভাব বড়া বহুৎসে ব্যবহারোমে আভীতক্ বীররসানুসরণ চলাআতা হ্যায়। কিন্তু বিদ্যাবিরোকা সময় এক—দো হাজার বর্ষসে প্রাচীন প্রতীত নহি হোতা। তদনন্তর শৃঙ্গার রসকা রাজ্য বড়া ইসরসকে রাজ্যসে সভী বিদ্যাওকি বহুৎ ক্ষতি হুই। ইয়োহিদশা-প্রায় সব দেশোকি ক্রমসে হোত হ্যায় কেঁয়োঁ কি উক্ত তিনো রসোকা চক্র নিরন্তর ঘুমতা রহতা

হ্যায় জৈসে অনেক প্রকারকে বাদ্য হোনেসে উনকি বাদন-প্রণালী অনেক প্রকারকী হ্যায়। গানপ্রণালী ভী অনেক প্রকারকী হ্যায় যথা ধ্রুবপদ (ধুরপত) খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ইত্যাদি। ইনমেসে ধ্রুপদকি প্রণালী সবসে প্রাচীন হ্যায় শ্রীহরিদাস স্বামী, তানসেনজী, বৈজু ইত্যাদি লোগ ইসী প্রণালীকে আচার্য্য থে। ইস প্রণালীকে উস্তাদলোগ গান-কালমে প্রথম গেয় রাগকা আলাপ করতে হ্যায় ফির উস্ রাগকি সরগমোকো ঔর ফির চীজো (পর্দা) কি গাতে হ্যায়। আলাপ করণা বড়া ক্লিষ্ট হ্যায় আলাপকো বে হি ওস্তাদ কর সকতে হ্যায় জিনমে কল্পনাশক্তি হোতি হ্যায়।

কিসী ছন্দোবদ্ধ কবিতা (পদ) মে জো কিসী রাগ কি তানোকে তথা কিসী তালকো নিয়ত কব্ দেতে হ্যায় উসে ধুরপত্ কহতে হ্যায় যহ তানোকা নিয়ত করনায় সহজ নহি হ্যায়, বড়ে ওস্তাদ লোগ হী উত্তম প্রকারসে কর সকতে হ্যায়। যদ্যপি ধুরপত্‌মে কল্পনাশক্তি কা কাম নেহি তথাপি উসকো যথার্থ রূপসে ইয়াদ্ কর যথার্থ রূপসে সভামে গানা সহজ নেহি। ওস্তাদনে ধুরপত্ কি তানে জৈসী বাতাই হ্যায় ঐসি হি রহনী চাহিয়ে বিগড়ে ন ইয়েহি ইস্‌মে মর্ম হ্যায়। বিগড়ী তানোকো সুধারনা তো ফির বড়ি হি বুদ্ধি কা কাম হ্যায়। সুরদাসজী প্রভৃতি উত্তম কবিয়োঁকে পর্দোমেভি তানসেন বংশকে ওস্তাদ লোগোনে রাগতানে নিয়ত কি হ্যায় যো আভিতক্ গানেমে আতি হ্যায়। ধুরপতিয়ে ওস্তাদ লোগ উক্ত রীতিসে আলাপ কর সরগম গা পাঁচ সাত উত্তম ধুরপত্ গা কর গানেকো

সমাপ্ত কর দেতে হ্যায়। ধুরপত্‌কে উত্তম ওস্তাদো কো সব রাগোকে মিলাকর হাজারো ধুরপত্‌ ইয়াদ হোতে হ্যায়। অন্তমে ইস বিদ্যামে তানসেন বংশনে বহুত্‌ হি উৎকর্ষকা সম্পাদন কিয়া। গানা শ্বাসকে অধীন হ্যায় ইসকারণ জৈসা হি শ্বাস লম্বা হোগা ওইসাহি গানা আচ্ছা হোগা কেঁয়োঁ কি যাঁহাতক্‌ এক শ্বাসসে পঁহুচনা চাহিয়ে উহাতক্‌ পহুচ্‌নেসে পুর্ব যদি শ্বাস টূট যায় তো তান টূটজানেসে গানকা আনন্দ বিগড়্‌ যাতা হ্যায়। উসপরভি তানসেনজীনে তথা উনকে পুত্র পৌত্রনে তো ধুরপতোমে এসী ষ্ঠানে রক্‌খী হ্যায় জিনকে লিয়ে বহুত হি লম্বে শ্বাস কি অপেক্ষা হ্যায়। তানসেনজীকে দৌহিত্রবংশনে যহ বিশেষতা কী কি অপনে ধুরপতোমে বীণাকি তানোকো রখদিয়া ইসসে ইন্‌কে ধুরপৎ ঔর ভি কঠিন হো গয়ে। বস্তুগত্যা জিসকো বীণাকা তত্ত্ব জ্ঞাত নেহি উসকেলিয়ে ইনকে ধুরপৎ বহুতহি ক্লেশপ্রদ হ্যায়।

প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

তানসেনের নাম বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত থাকলেও তাঁকে রক্ত মাংসের মানুষরূপে সাধারণ পাঠকবর্গের সম্মুখে, বোধ করি, গ্রন্থকারই উপস্থিত করলেন এই প্রথম। তানসেনের প্রতিভার ক্রমিক বিকাশের কথা—তাঁর পূর্ণ ক্রমে খ্যাতিপথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টাপ্রসঙ্গ এক কথায় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত এতদিন আবদ্ধ ছিল "আইন-ই-আকবরী" "পাদ্‌শানামা" প্রভৃতি বিখ্যাত অথচ স্বল্প পরিজ্ঞাত দুর্ভেদ্য গ্রন্থ-দুর্গের পাষাণ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে। সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল একমাত্র অনুসন্ধিৎসু প্রখ্যাত প্রতিভাশালী পণ্ডিতবর্গের। তথাকার অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান শুধু তাঁরাই জানতেন কিন্তু জনসাধারণকে তা জানাবার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্যও কোনদিন প্রদর্শন করতেন না। গ্রন্থকার সেই চির-প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করে, পাষাণ প্রাচীরের নীরব নেপথ্য থেকে সঙ্গীতসম্রাট তানসেনের জীবন কাহিনী আহরণ করে এনে বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে আজ সাদরে উপহার দিচ্ছেন। এই ধরণের সুলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্ভবতঃ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই।

আখ্যাত বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ অখণ্ডভাবে আকৃষ্ট করা, নায়ক নায়িকার ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা বর্ণনা দ্বারায় পাঠককে উৎফুল্ল কিম্বা উদ্বিগ্ন করা লেখকের লিপিকুশলতার পরিচায়ক বলেই পরিগণিত হয়ে থাকে। তানসেনের জীবন কাহিনীতে গ্রন্থকারও উক্তরূপ লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় প্রায় সর্বত্রই প্রদান করেছেন। ফলে কালের ব্যবধান অন্তর্হিত হয়েছে—যিনি সঙ্গীতানুরাগী ও সঙ্গীত-কলাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকটে এতদিন নামে মাত্র পর্য্যবসিত ছিলেন—

জনসাধারণ যাঁকে বহুদিন আগেশোনা পুরান বাজে কথার মত ভুলে গিয়েছিল, আজ তিনিই সহসা সঞ্জীবন মন্ত্রে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, বিস্মৃতি-সাগরের বীচিবিক্ষোভ অতিক্রম করে, আমাদের সম্মুখে পূর্বপরিচিত বন্ধুর মত এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা নির্বাক বিস্ময়ে মুগ্ধনেত্রে তাঁর মুখপানে চেয়ে আছি—আনন্দের পুলক শিহরণে কণ্টকিত হয়ে উঠছি এবং সম্রাট আকবরের রাজসভায় তাঁর অতুলনীয় প্রতিষ্ঠালাভ দেখে আনন্দে ও গৌরবে উল্লাসিত হচ্ছি।

কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের প্রসঙ্গ উঠলে বিদ্বজন প্রতিপালক মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের স্মৃতি স্বতঃই মানসপটে যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তেমনি তানসেনের কথা বলতে গেলেও যাঁর রাজচ্ছত্রের সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ ছায়াতল ছিল মনীষার একমাত্র বিকাশ-ভূমি, কোহিনুরকল্প অমূল্য অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে এনে রাজসভা সুশোভিত করাই ছিল যাঁর একমাত্র ব্যসন, সেই মহামনীষী গুণগ্রাহী দাতা সম্রাট আকবরের স্মৃতি প্রসঙ্গতই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে এবং আশঙ্কা হয় যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বললে তানসেনের কীর্তিকাহিনী বুঝিবা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সত্যসত্যই সম্রাট ছিলেন অসাধারণ গুণগ্রাহী—গুণের কিছুমাত্র পরিচয় পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন এবং সেই গুণী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করে তাঁর গুণের উৎকর্ষসাধনের সহায়তা করতেন। তাঁর রাজত্বকালে—"দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশি-নাশীঃ" কথাটী প্রকৃতপক্ষেই কিয়ৎ পরিমাণে নিরর্থক হয়ে গিয়েছিল। সভাসদ পণ্ডিতবর্গের মুখে লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিরোধের কথা শুনলেও, মহানুভব সম্রাটের দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছিল যে দারিদ্র্যের নিদারুণ দুর্দিনে পেচকের পক্ষ নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন রাজহংসের আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই থাকেনা। তিনি নিশ্চিতই জানতেন যে কমলার বরপুত্রগণের সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে বাণীর প্রিয়তম একনিষ্ঠ সেবকগণের প্রতিভার জ্যোতিঃ ম্লান হয়ে পড়ে—কারো

কারো জীবন স্রোত হয়ত সংসার মরুভূমির উষর বালুকাক্ষেত্রে অকালে ধারাহীনও হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীও তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি থেকে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়। এ কথাও তাঁর অজ্ঞাত ছিলনা যে—

"ক্রতৌ ব্যসনে বিবাহে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্মনি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষু ধনেষু বন্ধুষু—
ধনব্যয়স্তেষু ন গণ্যতে বুধৈঃ॥"

বহু অর্থব্যয়ে তাই রাজারাম বাঘেলার দরবার থেকে তানসেনকে দিল্লীতে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি নিরস্ত থাকেন নাই—ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্তদেশের সর্বজাতীয় গায়কগণকেই অনুসন্ধান করে এনে নিজের রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন—সাধারণের অবগতির জন্য তাঁদের নাম "আইন-ই-আকবরী"কার আবুল ফজলের উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত করা হল :—

THE IMPERIAL MUSICIANS

"I cannot sufficiently describe the wonderful power of this talisman of knowledge (Music). It sometimes causes the beautiful creatures of the harem of the heart to shine forth on the tongue and sometimes appears in solemn strains by means of the hand and the chord. The melodies then enter through the window of the ear and return to their former seat, the heart, bringing with them thousands of presents. The hearers, according to their insight, are moved to sorrow or to joy. Music is thus of use to those who has renounced the world and to such as still cling to it."

"His Majesty (Akbar) pays much attention to music and is the patron of all who practise this enchanting art. There are numerous musicians at his Court—Hindus, Iranis, Turanis, Kashmiris—both men and women."

"The Court musicians are arranged in seven divisions. One for each day in the weak. When His Majesty gives the order, they let the wine of harmony flow, and thus increase intoxication in some and sobriety in others. A detailed descriptlon of this class of people would be too difficult, but I shall mention the principal musicians."

"1. Miyan Tansen [1] of Gwalior. A singer like him had not been in India for the last thousand years. Raja Ramchand Baghelah was the patron of this renowned musician and Singar Tansen. His fame had reached Akbar and in the 7th year emperor sent Jalaluddin Quirchi to Bhatah to induce Tansen to come to Agrah. Ramchand feeling powerless to refuse Akbar's request, sent his favourite with musical instruments and many presents to Agrah and the first time that Tansen performed at the Court, the emperor made him a present of two lakhs of rupees. Tansen remained with Akbar. Most of his compositions are written in Akbar's name and his melodies are even now-a-days, everywhere repeated by the people of Hindusthan."

2. Baba Ramdas [2] of Gwalior, a singer."
3. Subhan Khan " "
4. Srigyan Khan " "
5. Miyan Chand " "
6. Bichitra Khan, brother of Subhan Khan, a singer.
7. Mahammed Khan Dhari, sings.

---

[1] Ram Chand is said to have once given Tansen one crore of Tankahs as a present. Ibrahim Sur, in vain, persuaded Tansen to come to Agra. Abul Fazl mentions below his son Tantarang Khan and the Padishanama mentions another son of the name of Bilas.

[2] Badauni says Ramdas came from Luchnow. He appears to have been with Bairam Khan during the rebellion and Bairam once received from him one lakh of Tankahs, empty as Bairam's treasure chest was. He was first at the Court of Islam Shah and he is looked upon as second only to Tansen. His son Surdas is mentioned below.

8. Birmandal Khan of Gwalior, plays on the Surmandal.

9. Baz Bahadur, Ruler of Malwah, a singer without rival.

10. Shihab Khan of Gwalior, performs on the Bin.

11. Daud Dhari [3] sings.

12. Sarod Khan of Gwalior—sings.

13. Miyan Lal [4] of Gwalior—sings.

14. Tantarang Khan, son of Miyan Tansen—sings.

15. Mulla Ishaq Dhari—sings.

16. Usta Dost of Mashad—plays on the flute (Nai).

17. Nanak Jarju of Gwalior, a singer.

18. Purbin Khan—his son, plays on Bin.

19. Surdas, son of Baba Ram Das, a singer.

20. Chand Khan of Gwalior—sings.

21. Rang sen of Agrah—sings.

22. Shaikh Dewan Dhari performs on the "Karana"

23. Rahamutulla, brother of Mullah Ishaque, a singer.

24. Mir Sayyid ali of Mashad plays on the "Ghichak"

25. Usta Yusaf of Harat, plays on Tambura

26. Quasim surnamed koh-bar [5]. He has invented an instrument intermediate between the "Qubaz" and "Rubub"

27. Tash Beg of Quipchag, plays on Qubuz.

28. Sultan Hafiz Hussain of Mashad chants.

29. Bahram Quli of Harat, plays on the Ghichak.

30. Sultan Hashim of Mashad, plays on the Tambura.

---

[3] Dhari means a singer—a musician.

[4] Jahangir says in Tuzuk that Lal Kalawant (or Kalanwat a singer) died in the 3rd year of his reign, "Sixty or rather seventy years old. He had been from youth in my father's service. One of his concubines on his death, poisoned herself with opium. I have rarely seen such an attachment among Mahammudan women."

[5] Koh-bar, as we know from Padishanama, is the name of a Chagtai tribe. The "Nafaisul Maasir" mention a poet of the name of Mahamhad Quasim Koh-bar whose Nom-de plume was Cabri.

31. Usta Sha Mahammad plays on the "Surna".

32. Usta Mahammead Amin, plays on the Tamburah.

33. Hafiz Khwajaali of Mashad, chants.

34. Mir Abdullah, brother of Mir Abdul Hai, plays on the "Qanun".

35. Pirzadah [6], nephew of Mir Dawam of Khurasan, sings and chants.

36. Usta Muhammed Hossain [7], plays on the Tamburah."

তানসেনের সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের কিংবদন্তীর অভাব নাই—কিন্তু এগুলির পরস্পরের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলের ভাগ এতই বেশী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটী একটী গ্রহণ করলে অবশিষ্ট-গুলিকে সামঞ্জস্যের অভাবে পরিত্যাগ না করেই পারা যায়না। "নষ্টমূলাঃ জনশ্রুতিঃ" বা "Shade without substance" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যগুলিকে এ সমস্ত ক্ষেত্রে অচল বলেই মনে হয়। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কৃতি ব্যক্তিবর্গের তিরোধানের পরে তাঁদের স্মৃতিকে অবলম্বন করে সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকারের গল্প সকল দেশেই অন্ধ hero worshipper-দের দ্বারা রচিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকের সত্যানুসন্ধী দৃষ্টিতে এ সমস্ত গল্প নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলেও বাস্তবিকপক্ষে এগুলি আদৌ অবজ্ঞার বস্তু নয়, কারণ এর দ্বারাই আমরা নির্ভুলভাবে মৃতব্যক্তির জন প্রিয়তার পরিধির পরিমাপ করতে সমর্থ হই—তাই এই সমস্ত গল্প যাঁর সম্বন্ধে যত বেশী প্রচলিত তিনিই তত বেশীদিন জগতে জনসাধারণের স্মৃতিতে জীবিত থাকেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের মনে হয় তানসেনের সম্বন্ধে এই

[6] Pirzadha, according to Badaoni, was from Sabzwar. He wrote Poems under the "Takhalluc" of Liwai. He was killed in 905 at Lahore by a wall falling on him.

[7] The Masiri Rahimi mentions the following musicians in the service of the Khankhanan :—(*a*) Agah Muhammad Nai, son of Hazi Ismail of Tabriz. (*b*) Maulana Aqwati of Tabriz. (*c*) Ustad Mirja Ali Fatagi. (*d*) Maulana Sharaf of Nishapur, a brother of the poet Naziri. (*e*) Muhammad Mumin alias Hafizak, a Tamburah player. (*f*) Hafiz Nazar from Transoxiana, a good singer.

ধরণের গল্পগুলি অবাধে বহুল পরিমাণে সর্বত্র প্রচলিত হয়েছিল বলেই আজও তাঁর নাম সঙ্গীত-বেত্তাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং যতদিন ভারতবর্ষে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তানসেনের কীর্তিকাহিনী কখনও বিস্মৃতি-কুহেলিকায় আবৃত হবে না। কীর্তিমান বোধ করি এই ভাবেই চিরদিন জীবিত থাকেন। সম্ভবতঃ এই বিষয়টি লক্ষ্য করেই পণ্ডিতেরা বলেছেন : "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

যৌবনে হরিদাস স্বামীর কাছ থেকে তানসেন যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলেন, পরিণত বয়সে সেই শিক্ষাই তাঁকে একেশ্বরবাদী করে তুলেছিল। সত্যসত্যই তিনি ছিলেন সঙ্গীতের একজন একনিষ্ঠ সাধক এবং সেই সাধকোচিত মনোবৃত্তি প্রণোদিত হয়েই জীবনের অপরাহ্নে সঙ্গীতকে ধর্মসাধনের উপায়স্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অক্লান্ত কৃচ্ছ্র-সাধনায় পরিশেষে যখন সত্যের "কোটীসূর্য্যপ্রতীকাশং কোটীচন্দ্র-সুশীতলং" ভাস্বর দীপ্তি তাঁর নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, তখনই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন :—

"প্যারে তুঁহি ব্রহ্ম, তুঁহি বিষ্ণু, তুঁহি শেষ, তুঁহি মহেশ।
তুঁহি আদ, তুঁহি নাদ, তুঁহি অনাদ, তুঁহি গণেশ॥
জলস্থল মরুত বোম
তুঁহি অকার যমসোম
তুঁহি অকার তুঁহি মকার
নিরোঙ্কার, তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ
তুঁহি হদীশ তুঁহি কোরাণ
তুঁহি ধ্যান, তুঁহি জ্ঞান, তুঁহি ভুবনেশ॥
তানসেন কহে ব্যান তুঁহি, দেন তুঁহি রমন।
তুঁহি ঘর পলয়ুন
তুঁহি বরুন তুঁহি দীনেশ॥"

যশোমণ্ডিত সুদীর্ঘ জীবনের পরিশেষে, নির্মল আকাশে অস্তগামী দিনপতির দিনান্তের অবসানের মত দীপ্ত গৌরবের রক্তসমুদ্রে সহসা যে দিন তাঁর জীবন তরণী নিমজ্জিত হ'য়েছিল সে দিন কেবল যে আগ্রা নগরী এবং তদানীন্তন ক্ষুদ্রায়তন মোগল সাম্রাজ্যই নিদারুণ শোকাবেগে মুহ্যমান হয়েছিল তা নয়, সে মর্মন্তুদ বিয়োগ দুঃখ প্রবাহ সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষকেও নিঃশেষে পরিপ্লাবিত ও আলোড়িত করেছিল। "আইন-ই-আকবরী" প্রণেতা আবুল ফজল যথার্থই লিখেছেন—"তানসেনের ন্যায় গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যেও একজন জন্মে নাই।" তানসেনের পূর্ব ও পরবর্তী গায়কগণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে আবুল ফজলের এ মন্তব্যকে কোনক্রমেই অতিশয়োক্তির পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

তানসেনের স্বরচিত গান অদ্যাপি দুষ্প্রাপ্য হয় নাই বটে, কিন্তু এখনও যেগুলি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কোনটী তাঁর নিজের রচনা আর কোনটী অপরের তা সঠিক বলা কঠিন। নিম্নে আমরা তাঁর প্রথম বয়সের রচিত একটি গান উদ্ধৃত কচ্ছি :—

"মনগজভয়ো অরসমান অত প্রবল চবড়হে প্রচণ্ড সঠ দরিদ্র
অষ্টান কোরী। মনগজ-টেক।
উরব তুরব ধুন্ধকার মদন দুহাই তাকী ঘরতানা ঘর গাঢ়ে সনমুখ
হোত জাকোঁ শুণ্ডবারো॥
মন-১
ইমন্দ ইমন্দ কীমন্দ কুকব বহু প্রবল ফুঁণী ফুঁকারো ; তানসেনকোঁ
ডারেকারে আগেগুব একদন্ত দুজী শুণ্ডমে উঠারো।
মন ২।

—প্রকাশক

শুদ্ধিপত্র

১। মূল গ্রন্থের ১৩০ পৃঃ "ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর-এর" পরিবর্তে ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর পড়িতে হইবে।

২। পরিশিষ্ট—ক—এর ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত জগন্নাথ কবিরাজ-এরই মতান্তরে অন্য নাম জনার্দন কবিরাজ। কেহ কেহ এঁকেই ভাবভট্টের পিতা জনার্দন ভট্ট বলে ধরে নিয়েছেন। ৺ভাতখাণ্ডেজীও এই মতই পোষণ করতেন। তানসেনের সময়ে পুণ্ডরীক বিঠ্‌ঠল ও ভাবভট্টের পিতা জনার্দন ভট্ট জীবিত ছিলেন। তানসেনের সম্বন্ধে তাঁরা কেউ কিছু লেখেন নাই। ভাবভট্ট তাঁর "অনূপবিলাস" নামক গ্রন্থে তানসেনের আবিষ্কৃত 'দরবারী কানাড়া' সম্বন্ধে লিখেছেন—"জো দরবারী সো শুদ্ধ কহাবে"।